নব্যভারত।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

তৃতীয় খণ্ড—১২৯২।

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র।

তৃতীয় খণ্ড নব্যভারতের সূচিপত্র।

নব্যভারত

তৃতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।] ১২৯২ [প্রথম সংখ্যা।

অনন্তের লীলা।

"This Universe, ah me, what could the wild man know of it; what can we yet know? That it is a Force, and thousandfold Complexity of Forces, a Force which is not we." * * * * * * * * * * * "How every object still verily is a window through which we may look into Infinitude itself."—*Carlyle.*

জীবন-শাস্ত্র এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। কি আশ্বাসে আছি, জানি না; কি কর্ত্তব্য পালনের জন্ত আসিয়াছি, তাহা কিছুই জানি না। অথচ সময় নামে যে একটা অনমুভূত, কল্পনার অতীত অনন্ত পদার্থ সম্মুখে রহিয়াছে—তাহা ধরিয়া কেবলই চলিতেছি। চলিতেছি বটে, কিন্তু কল্যও যে এই প্রকার ভাবেই এই শরীর লইয়া চলিতে পারিব, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কল্য এই শরীর থাকিবে কিনা, তাহা জানি না;—কিন্তু তবুও আমার গতির রোধ নাই—অবিরতই চলিতেছি। আশা ধরিয়া লোক বাঁচিয়া থাকে, এই কথা লোকেরা বলে; কিন্তু কিসের আশা?—কোথায় আশা? লক্ষ্য যে জানে না, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ যাহার পক্ষে কল্পনা বই আর কিছুই নহে, পরিণাম যাহার ঘোর আঁধারে ঢাকা, তাহার আবার আশা কিসের? [illegible]বিক বোম কিছুই আশা নাই!—আশা, কল্পনা বই আর কিছুই নহে! কল্য বাঁচিয়া থাকিব কি না, তাহাই যে জানে না, তাহার আবার আশা কিসের? আশা-শূন্য হইয়াও মানুষ বাঁচিতেছে—ঐ অনন্ত-পথে ছুটিতেছে। কে টানিতেছে, কে ডাকিতেছে, মানুষ কিছুই জানিতেছে না, তবুও ছুটিতেছে। ছুটিয়া ছুটিয়া শিশু, বালকত্বে; বালক, যুবকত্বে; যুবক, বৃদ্ধত্বে; বৃদ্ধ, মৃত্যুতে পৌঁছিতেছে। নিরাশা আঁধারে ডুবিতে, মানুষ কত অহঙ্কার-স্ফীত বক্ষে ছুটিতেছে! অনন্তকে সম্মুখে করিয়া, ক্ষুদ্র জীবন-ঝরণা কেমন তীর-বেগে ছুটিতেছে! আপনাকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য, আঁধারে ডুবাইবার জন্য মানুষের কতই উল্লাস, কতই অহঙ্কার, কতই গরিমা! জীবন-শাস্ত্র কি এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা!!

সকলই যেন অনন্ত। উদ্দেশ্য বা পরিণাম, মানুষ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

জড় ধরিয়া যে চলিল, সেও অনন্তে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইল, কিছুই কূলকিনারা করিতে পারিল না;—শক্তি ধরিয়া যে চলিল, সেও অকূলে পড়িয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, মানুষের সকল পরাস্ত হইয়া গেল। বিজ্ঞানের শক্তি জড়ের নামকরণ করিতেই শেষ হইল,—দর্শন সংজ্ঞা-সাগরে মিলিয়া মিশিয়া গেল। বিজ্ঞান, দর্শন আর কি?—কেবল জড়ের নামপুঞ্জ, কেবল সংজ্ঞা-সাগর। নামকরণেই বিজ্ঞান দর্শন ব্যতিব্যস্ত ছিল, আজন্ম তাহা করিয়াও অনন্তের শেষ করিতে পারিল না,—অনন্ত প্রকৃতির শেষ পরিণাম স্থিরীকৃত হইল না। মানুষের অহঙ্কার কিসের?—ক্ষুদ্র মানুষ—অবোধ,—অজ্ঞান, অনন্ত-প্রকৃতি-তত্ত্বের কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। কেহ কূল কিনারা করিতে না পারিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। অনধিগম্য—দুরবগাহ অনন্ত শক্তির বিষয় ভাবিয়া মানুষ চমকিত হইল—মস্তককে বিস্ময়ে অবনত করিল। কেহ বা এমনই হইয়া রহিল যে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়াও দর্শন-বিজ্ঞানের ধুয়া ধরিয়া, নামের উপরে জড়ের নাম উচ্চারণ করিয়া কতই বিজ্ঞতা বা অহঙ্কারের পরিচয় দিল। ইহাদের কথা আর কি বলিব? ইহারা কিছু না বুঝিয়াও বিজ্ঞ, কিছু না পাইয়াও বড়, কিছু না জানিয়াও বিদ্বান! যাঁহাদের মস্তক বিস্ময়ে অবনত হইল,—তাঁহারা অনন্ত শক্তির সহিত ভাসিয়া চলিলেন,—যেন লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন—অবলম্বহীন। ভাসিয়া ভাসিয়া,—অদৃশ্য অনন্ত সমুদ্র-সাগরে ডুবিলেন। সময় ধরিয়া উঠিলেন, অনন্ত কালের ক্রোড়ে ডুবিলেন। এমনই করিয়া কত লোক অনন্তে ডুবিল, আর ফিরিল না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে কত বিন্দু অনন্ত-সাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ কি নিরূপণ করিতে পারে? সীমা, অসীমে মিশিতেছে; জড়, অজড় শক্তিতে লীন হইতেছে। ক্ষুদ্র ও মহত্ত্ব, সকলই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অথবা সীমাই বা কি, জড়ই বা কি, ক্ষুদ্রই বা কি, মহৎই বা কি?—সকলই অসীমের খেলা,—সকলই শক্তির অলক্ষিত তরঙ্গ মাত্র। ক্ষুদ্র শক্তি, অনন্ত শক্তি-সাগরে মিলিতেছে। একদিন, দুদিন করিয়া সাত দিন গণিলে সপ্তাহ হয়, চারি সপ্তাহে মাস, বার মাসে বৎসর, বার বৎসরে যুগ। যুগে যুগে মিলিয়া কত অনন্ত যুগ হইতেছে, শেষে আর মানুষ গণিতে পারিতেছে না।—একে আরম্ভ করিয়া, সকল সংজ্ঞা অনন্তে পরিণত হইয়েছে। এক, দুই করিয়া গণিতে গণিতে শেষে আর সৃষ্টির সংখ্যা করা যায় না—সকল অনন্ত বলিয়া বোধ হয়। এক সাগরে কত জলকণা, এক কণাতে কত পরমাণু! পরমাণুরই বা শেষ কোথায়?—কে গণিয়া ধারণা করিতে পারে? পরমাণুর শেষ কোথায়, মানুষ ভাবিতে পারে না, কল্পনাও করিতে পারে না। সকল জড়ই বিভাজ্য, কিন্তু পরমাণুর নাকি আর বিভাগ হয় না, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। পরমাণুর ভিতরে যে অবিভাজ্য অনন্ত শক্তির রাজ্য, মানুষ তাহা বুঝিল না। এই প্রকার করিয়া যে একবার গণিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই শেষে অনন্তে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক যখন শত হয়, শত যখন সহস্র হয়, সহস্র যখন লক্ষ হয়, লক্ষ যখন কোটী হয়,

তখন সে সকলকে গণন করিয়া মানুষের মস্তক আর কিছুই ধারণা করিতে পারে না,—তখন সকলই অনন্ত বলিয়া মনে হয়। যে একবার এ পথে চলিয়াছে, সেই মজিয়াছে। যে কখনও কিছুই জানিতে চেষ্টা করে নাই, সেই ভাল আছে; কিন্তু যে একবার জানিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই, নিউটনের ন্যায় শেষে অনন্তের তীরে বসিয়া, নিরাশার সঙ্গীতে জগৎকে ডুবাইয়া, অনন্তে আত্মশরীরকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। তুমি আমি কোন ছার জীব! গণিবার সাধ থাকে, একবার এস, নিশ্চয় তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। ঐ আকাশে চাহিয়া বলত, কত নক্ষত্র আকাশে,—প্রত্যেক নক্ষত্রে কত জীব,—প্রত্যেক জীবে কত পরমাণু! পৃথিবীর পানে চাহিয়া বলত, এখানে কত বৃক্ষ, এক বৃক্ষে কত পত্র,—এক এক পত্রে কত কীট। পরিমাণ করিবে?—গণনা করিবে? হা! বালক মানুষ, তোমার অহঙ্কার আর কতক্ষণ! গণিতে আরম্ভ করিয়া দেখ,—অমনি অনন্ত তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! মানুষ অবশেষে অনন্তে যাইয়া ডুবিতেছে,—সকলের আশা, সকলের অহঙ্কার, অনন্ত কাল সাগর গ্রাস করিতেছে।

গণিতে বসিয়া আমরা মজিয়াছি। এক বৎসর গেল, দুবৎসর গেল,—কত দিন গেল,—কত সময় কাটিয়া গেল—এক দুই করিয়া, অনন্ত কালের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে সময় গেল বা যে সময় ছিল, সে সকলই অনন্তে মিশিয়া রহিল। [illegible]ীর মৃত্তিকা হইতে বিন্দু বিন্দু বাষ্প[illegible]ক তুলিয়া যেমন পাহাড়ের গায়ে [illegible]নব হইয়া লাগিয়া থাকে, আমাদের জীবন-মৃত্তিকা হইতে দিন, মাস, বৎসরব্যাপক সময়, কত কি লইয়া অনন্তে মিশিয়া থাকিল, আমরা তাহা কিছুই গণিতে পারিলাম না। গত বৎসর কি ঘটিল, কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি পাইলাম,—কি বলিতে পারি? যাহা গেল—সে সকলই অনন্তে মিশিল। গত বৎসর, কত কি উপার্জ্জন করিয়া, অনন্তের অনন্তত্ব বৃদ্ধি করিল। প্রত্যেক বৎসরই করিতেছে। আমরা অবাক্ হইয়া অনন্ত শক্তি-সাগরের ক্রীড়া দেখিতেছি, আর বিস্ময়ে নিমগ্ন হইতেছি।

কি জানি যে, অহঙ্কার করিব? ক্ষুদ্র হইয়া জন্মিয়াছি—ক্ষুদ্রই রহিয়াছি, অনন্ত-তত্ত্ব কিছুই ত জানি না, তবে কিসের অহঙ্কার করিব! অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। ভাই, বিজ্ঞ মনুষ্য-সন্তান, সামান্য জ্ঞানবালির বাঁধে অসীম সময়-সাগরকে পরিমাণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার শক্তি তোমার ভাণ্ডারে কিছু থাকে, তুমি অহঙ্কার কর,—হাসাও, মাতাও, কাঁদাও। আমাদের কিছুই নাই—অনন্তের নিকট আমরা যেন কিছুই নই। কিছুই নই বটে, কিন্তু আবার কিছু হই। একবার নাই,—আবার আছি। অনন্তের সহিত তুলনায় আমরা যেন নাই, সীমার সহিত তুলনায় আছি। "নাই নাই" মিলিয়াই অনন্ত "হই হই" উৎপন্ন হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিলিয়াই অনন্ত হইতেছে। অণু অণু মিলিয়াই মহা সাগর হইতেছে। এ এক গভীর শাস্ত্র। অনন্তের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র কীটের অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চায়?—বড় বস্তুর কথা বিস্মৃত হইয়া, কে ছোট বস্তুর নাম লইতে চায়? চন্দ্রকে ভুলিয়া কে জোনাকীকে গণিতে চায়?—বড়র কাছে ছোটর আদর নাই। অনন্তের নিকট ক্ষুদ্রের আদর নাই বটে,

কিন্তু ক্ষুদ্র না থাকিলেও অনন্ত থাকে না, অনন্তত্ব পূর্ণ হয় না। পরমাণু না থাকিলে জড় হয় না,—আমি না থাকিলে তুমি হও না, এবং আমি ও তুমি, সকলে না থাকিলে সমাজ হয় না,—সমাজ না থাকিলে দেশ হয় না, দেশ না থাকিলে রাজ্য হয় না, রাজ্য না থাকিলে প্রকৃতি শুধুই শূন্য—কল্পনা—ছায়া। এক সময়ে যাহা অনাদৃত, আর এক সময়ে তাহারই আদর হইতেছে। এই প্রকারে 'নাই' সময়ে 'হই' হইতেছে। মূল কথা, আমরা অতি ক্ষুদ্র হইলেও,—'নাইর' মত বোধ হইলেও, আমরা আছি। কেন আছি, জানি না, কত দিন থাকিব, জানি না,—তবুও আছি। আছি বলিয়াই আমাদের কার্য্যও আছে, গতিও আছে। উদ্দেশ্যবিহীন কিছুই প্রকৃতির ভাণ্ডারে নাই। সকলই উদ্দেশ্যপূর্ণ। আমাদের জীবনও উদ্দেশ্যপূর্ণ। কি উদ্দেশ্য আমাদের, তাহা আমরা কি জানি? তুমি বড়, তোমার গৌরবে জগৎ অলঙ্কৃত, তোমার কাছে আমাদের অস্তিত্ব অনাদৃত, কিন্তু তুমি অগ্রে যাইবে কি আমরা যাইব, তাহা কিছুই আমরা জানি না। জানি না, তুমিই অধিক কার্য্য করিবে, না আমরা করিব?—এইমাত্র জানি, বড় ছোট সকলই উদ্দেশ্যপূর্ণ, সকলেরই কার্য্য আছে। কাহার দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হইতেছে, জানি না,—এ অনন্ততত্ব বুঝিতে যাইয়া আমরা বিস্ময়ে ডুবিয়া গিয়াছি—এ গভীর পারের কূল কিনারা পাই না। আমরা যাহা জানি, তাহা এই,—বড় ছোট সকলই আছে—কেবল অনন্তত্ব প্রচার করিতে!—তোমরাও করিতেছ, আমরাও করিতেছি। হিংসা বিদ্বেষ করিলে তাহা কি হইবে? তোমার পার্শ্বে আমি না থাকিলে, সৃষ্টির গভীর উদ্দেশ্য সফল হয় কই? বড়র ধারে ছোট না থাকিলে চলে কই? বড় জীবিত থাকিলে, ছোট মরিবে, যে মনে করে, সে মূর্খ! মহাগৌরব-স্ফীত ইংলণ্ড আছে বলিয়া ভারত-সমাজ মরিয়া যাইবে, তুমি ভাবিতেছ? ইংরাজি ভাষার সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির নিকটে সামান্য বাঙ্গালা ভাষা নিবিয়া যাইবে, মনে ভাবিতেছ!—হ্যাট কোটের তাড়নায় ধুতি চাদর উড়িয়া যাইবে, ভাবিতেছ;—সুসভ্য ইংরাজের অস্তিত্বে বাঙ্গালী বিলুপ্ত হইবে, মনে করিতেছ? তোমার ন্যায় মূর্খ আর কে আছে। ইংলণ্ডের যদি প্রয়োজন থাকে, তবে ভারতেরও আছে, ইংরাজি ভাষার যদি আবশ্যকতা থাকে, তবে বাঙ্গালা ভাষারও আছে; হ্যাট কোটের প্রয়োজন থাকিলে ধুতি চাদরেরও প্রয়োজন আছে। জ্ঞান চাইত প্রেমও চাই—বীর্য্য চাই ত কোমলতাও চাই;—কার্য্য চাই ত শান্তিও চাই। মানুষ কেবল যুদ্ধ করিবে না, যোগসাধনও করিবে। মানুষ কেবল কার্য্য করিবে না, বিশ্রামও করিবে। মানুষ কেবল শীতে মজিবে না, গ্রীষ্মও ভোগ করিবে। একের অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব যায় না,—তা বড়ই হউক, আর ছোটই হউক। শীত-প্রধান রক্তপিপাসু ইংলণ্ডের হ্যাটকোট, গ্রীষ্মপ্রধান যোগধর্ম্ম-লালায়িত ভারতে কখনই চির-আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না। ইংলণ্ড যদি বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকে তবে ভারত আধ্যাত্মিক বলে পারিবে। এক উদ্দেশ্য কখনই দুইয়ের হইতে পারে না। যাহা ভারতের অদৃষ্টে না[illegible] তাহা কখনই হইবে না। কখনই হই[illegible] —রক্তপিপাসা কখনই ভারতের

চিরশান্তিময় বুকে স্থান পাইবে না; ভারতের বীরত্ব হৃদয়ে;—ভারতের শক্তি হৃদয়ে। ভলণ্টিয়ার শ্রেণীতে যাইবার জন্যই ব্যস্ত হও, আর গৃহে বসিয়া কুস্তিই কর,—হৃদয়-শূন্য পশুর বৃত্তি ভারতের নহে। হ্যাটকোট ভারতে টিকিবে না—শুধু বাহুবলে ভারত কখনই জয় লাভ করিতে পারিবে না। ভারতের শক্তির রাজ্য—হৃদয়ে। কেন ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছ?—কেন হৃদয়শক্তির স্থানে পাশব-শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছ? ও আকাশকুসুম সদৃশ বাসনা কখনই পূর্ণ হইবে না। বিশেষত্ব ঘুচিবে না—একের অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। ভারত থাকিবে—ভারতের জাতি থাকিবে, ভারতের ধর্ম্ম থাকিবে—ভারতের ভাষা থাকিবে। ভারতকে ঘৃণা করিয়া ইহার প্রতি কেহ চাহিও না, ভারতের ধর্ম্মকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখ,—ভারতের অভিনব ভাষাকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখ, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, বৈচিত্র্য যদি সৃষ্টির লক্ষ্য হয়,—সকল বস্তুতেই যদি অভ্রান্ত সত্য থাকে,—সকল সত্যই জয়যুক্ত হওয়া যদি বিধির নিয়ম হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, একদিন এইপরপদদলিত ভারতের ধর্ম্ম,—পুণ্য-পবিত্রতা, শান্তি ও প্রেম, জগৎকে জয় করিতে পারিবে,—ভারতের মলিন ভাষা, এক দিন আপন ক্রোড়ের লুক্কায়িত সত্যরত্নের দ্বারা জগৎকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে। বৃহতেও সত্য আছে, ক্ষুদ্রেও সত্য আছে;—শীত-প্রধান দেশেও আছে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশেও আছে,—সকল মিলিয়াই সৃষ্টি-সিন্ধু। তুচ্ছ করিলে চলিবে কেন?—ঘৃণা করিলেই বা হইবে কেন? বৃহৎ ক্ষুদ্র, ছোট বড়—সকল মিলিয়াই—অনন্ত। অনন্তেরই লীলা—ক্ষুদ্রে; অনন্তেরই লীলা—বৃহতে। আবার ক্ষুদ্র বা কে, বৃহৎ বা কে? সময় ভেদে, উদ্দেশ্য ভেদে, ক্ষুদ্রই বৃহৎ; বৃহৎই ক্ষুদ্র; যাহার যে কার্য্য, তাহাতেই সে বৃহৎ। লেখক, লেখার জন্য বৃহৎ; বক্তা, বক্তৃতার গুণে বৃহৎ। রাজা, রাজ্য শাসন-করিবার শক্তিতে বৃহৎ; প্রজা, কৃষি কার্য্যের জন্য বৃহৎ। এক জনের কার্য্য অপরের দ্বারা সংসিদ্ধ হয় না যখন, তখন কাহাকে ছোট, কাহাকে বড় বলিবে? আপন আপন রাজ্যে, সকলেই বৃহৎ। বৃহৎ হইয়াও, অনন্তের সহিত তুলনায় সকলই অতি ক্ষুদ্র। তারতম্য, ভেদাভেদ, এ সকল কেবল কূট বুদ্ধিপরিচালনার ফল। যাহার হৃদয়ে বল আছে, সেও আদরের, যাহার বাহুতে বল আছে, সেও আদরের। জ্ঞানী, জ্ঞানীকেই বড় মনে করে, প্রেমিক প্রেমিককেই বড় দেখে। যোদ্ধা যোদ্ধাকেই অধিক পূজা করে, ধার্ম্মিক ধার্ম্মিককেই অধিক ভালবাসে। যাহার মন যে দিকে, সে তাহাকেই বড় দেখে। গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলে,—বড় ছোট এ ভেদাভেদ বিশেষ ভাবাপন্ন বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের চিন্তার বিকৃত ফল মাত্র:—বাস্তবিক বড় ছোট, এ ভেদাভেদ আর থাকে না—সকলকেই আপন আপন বিশেষত্বে প্রধান বলিয়া বোধ হয়। সকলই যেন অনন্তের কণা। অনন্তের নিকট বৃহৎও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রও ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র বাদে অনন্তত্ব পূর্ণ হয় না, বৃহৎ বাদেও হয় না। কাহার দ্বারা কি কার্য্য হইবে, কে জানে, কাহার কি উদ্দেশ্য, কে জানে? সকলকেই আদর করিতে হইবে। সকল বস্তুতেই শক্তির ক্রীড়া। শক্তি মাত্রই আদ্যাশক্তি-প্রসূত। সকল ঘটেই ভগবান

বিদ্যমান। পরস্পরকে আদর করিতে করিতে অনন্ত শক্তিসাগরে যাইয়া অস্তিত্বকে ডুবাইতে হইবে।—যাইতে যাইতে, পাইতে পাইতে, অনন্তত্বে নিমগ্ন হইতে হইবে। আমরা সকলেই অনন্তের পথে খেলা খেলিতেছি। আমরা যাহা করিতেছি, এ সকলই অনন্তের কথা। তোমার ভিতরে এক অনন্ত রাজ্য, আমার বুকের ভিতরে আর এক অনন্তের রাজ্য। ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া, কে শেষ করিতে পারে? গভীরভাবে যখন প্রকৃতি তত্ত্ব চিন্তা করিতে বসি, তখন একেবারে বিস্ময়ে নিমগ্ন হই। একটী বালুকণা বা একটী ক্ষুদ্র সামান্য কীট হইতে, সুবৃহৎ পর্ব্বত বা মহান মানুষ-সাগর, এ সকলের ভিতরেই এক অনন্ত রাজ্য। জড়কেও সীমাবদ্ধ ভাবা যায় না,—অণু হইতে পরমাণুতে যাও,—যাইয়া বুঝিবে,—সেখানেও অনন্ত, আর কূল কিনারা নাই। মানুষ বুঝিতে যাইয়া, ধরিতে যাইয়া, শেষে পরাজয় স্বীকার করে। কোন তত্ত্বেরই শেষ তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞান, বিদ্যা বা শক্তি ধরিতে পারে না। মানুষ আপন তত্ত্ব জানে না, পরতত্ত্বও জানে না। কিসের বা অহঙ্কার, কিসের বা আত্মাভিমান। আত্মবোধ বা পরবোধ, কোন বোধেরই শেষ নাই! হায়, মানুষ কত ক্ষুদ্র! হায়, মানুষ যাহা জানিয়াছে বা জানিবে, তাহা কত সঙ্কীর্ণ! মানুষ অনন্ত শক্তি-সাগরে অবশেষে অবশ অঙ্গকে ভাসাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে। যখনই মানুষের প্রাণে এ বোধ জন্মিতেছে যে, কিছুই জানা বা বুঝা হইল না, তখনই শরীর অবশ হয়;—তখনই দেহকে ভার বলিয়া বোধ হয়;—মানুষ তখন ইচ্ছা করিয়া অনন্তে ঝাঁপ দিয়া মরে। পতঙ্গ তখন ইচ্ছা করিয়া আগুনে শরীরকে পোড়াইয়া সুখী হয়। যত দিন অনন্তত্ব বোধ না হইতেছে,—যত দিন মানুষের প্রাণ বিশাল-বিস্তৃত আকাশে না উঠিতেছে,—যত দিন উদারতার বিশ্ব-বিস্তৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব হৃদ্‌বোধ না হইতেছে;—ততদিন ক্ষুদ্র শরীর বাহনে ক্ষুদ্র মানুষ চলিতেছে, ফিরিতেছে,—উঠিতেছে, বসিতেছে। তাহাই বা কত দিন? অনন্তের সহিত তুলনায় এক মুহূর্ত্ত মাত্র। মানুষ-পতঙ্গ এক মুহূর্ত্ত জীবন লইয়া মাতামাতি করিতেছে—পরে জীবনকে ডুবাইয়া দিতেছে! একজন যাইতেছে, তাহার পশ্চাতে আর একজন আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে আর একজন,—এমনি করিয়া অনন্তের চক্র পূর্ণ হইতেছে! এক, দুই, তিন, গণিতে গণিতে শেষে অনন্ত হইয়া যাইতেছে। যত দিন এই গভীর অনন্ত-তত্ত্ব হৃদ্‌বোধ না হইবে, তত দিনই অহঙ্কার বা সঙ্কীর্ণতা, এবং ততদিনই মানুষের পৃথিবীতে স্থিতি। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে—মানুষ আর থাকিতে চায় না—অমনি মাথা হেঁট করিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া মরে। জ্ঞানী নিউটন এমনই করিয়া মরিয়াছেন, প্রেমিক নিমাই এমনই করিয়া ঝাঁপ দিয়াছেন। অনন্ততত্ত্ব বুঝা ভার, অনন্ত কার্য্য সম্পন্ন করা কঠিন, অনন্ত কর্ত্তব্য পালন করা অসাধ্য, এ বোধ জন্মিলে মানুষ আর টিকিতে পারে না। যে ক্ষুদ্র বালক নিমাই বাহু দিয়া মাতাকে বাল্যকালে কত আদরে বুকে পুরিতে চাহিত, সেই প্রেমিক-গৌরাঙ্গ যুবক হইয়া কত জনকে কোল দিয়া কৃতার্থ হইলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন—কোলকে অনন্তে প্রসারিত না করিতে পারিলে আর চলে না,—সীমাবদ্ধ ভালবাসাতে যখন আর

তাঁহার তৃপ্তি হইল না, তখন তিনি অনন্তে শরীরকে বিসর্জ্জন দিলেন! কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ?—বলিয়া সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত নরনারী কত কাঁদিতেছে, কিন্তু সোণার চাঁদ আর নদিয়ায় ফিরিলেন না;—নীলাচলে যাইয়া অনন্ত নীলিমায় মিশিয়া গেলেন। পবিত্রাত্মা যিশুখ্রীষ্ট ক্রূশকাষ্ঠ হইতে নামিলেন না কেন?—তোমরা জান কেহ? অনন্ত কর্ত্তব্য শেষ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি অনন্তে মিশিলেন, ফিরিলেন না। আশা ততক্ষণ মানুষকে ভুলাইতে পারে, যতক্ষণ মানুষ সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ। আশা যখনই কল্পনা বলিয়া বোধ হয়,—আত্মা মন যখনই অসীমে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন আর স্বার্থপূর্ণ বাসনা থাকে না;—তখন কেবল বিস্ময়, কেবলই নিরাশা—কেবলই হতাশ-সঙ্গীত মানস-সরোবর হইতে উত্থিত হইতে থাকে। মানুষ ততদিনই শরীরের যত্ন করে, যতদিন শরীরের অতীত কোন তত্ত্ব সে জ্ঞাত না হয়;—মানুষ ততদিনই পরিবার প্রতিপালন করে, যত দিন জগতের অন্য কোন কিছুর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের দ্বার অবরুদ্ধ থাকে। আপন শরীর এবং পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে, যখন মানুষের আত্মা আরো বিস্তৃত হয়,—তখন মানুষ আর শরীর-গৃহে বদ্ধ থাকিতে পারে না। শরীরের প্রেম পরিবারে যায়, পরিবারের প্রেম দেশ দেশান্তরে যায়;—শেষ যখন অনন্ত কর্ত্তব্য হৃদ্‌বোধ হয়, তখন মানুষ হতবুদ্ধি হইয়া, নিরাশ অন্তরে, ঝাঁপ দিয়া মরে। মানুষ এমনই করিয়া কত উল্লাসে পথ ধরিতেছে,—কত নিরাশায় পলায়ন করিতেছে। আশা ভরসা—কালে সকল মহা আঁধারের কোলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। যত দিন সে অনন্ত-বোধ না হইতেছে, তত দিন ইচ্ছা করিলেও কেহ মরিতে পারে না। জীবন-মায়া বিষম মায়া;—কেহই পরিত্যাগ করিতে চায় না। মরিতে কাহার সাধ? সকলেই জানেন, সকলেরই মরিতে অসাধ;—কিন্তু এক সময়ে আবার সকলেই মরিতেছেন। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াও মানুষ মরিতে পারে না,—আর এক সময়ে বাঁচিয়া থাকিতেই আর ইচ্ছা যায় না। সীমা বোধ যতদিন, ততদিন মায়া, ততদিন মোহ;—অনন্ত বোধ যখন, তখনই মহাবৈরাগ্য—তখনই দেহ-বিসর্জ্জন। আমরা আজও যে আছি, তাহার কারণ আজও আমাদের অনন্তত্ব-বোধ জন্মে নাই। আজও যেন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে হইতেছে;—আজও যেন পাইতে ইচ্ছা হইতেছে,—দিতে ইচ্ছা হইতেছে;—আজও ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিতে ইচ্ছা হইতেছে;—আজও ভারতকে একপ্রাণে বাঁধিতে ইচ্ছা হইতেছে। যখন এ ভাব থাকিবে না,—ভারত হইতে কর্ত্তব্য প্রসারিত হইয়া যখন জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে—তখন সবা-ভারত কূলকিনারা ভুলিয়া অকূল অনন্তকাল-সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে;—কেহ চিহ্নও দেখিবে না। তোমার ইচ্ছাতেই আমরা মরিব না,—কেহই মরিবে না। মরিবার পথ আপনা হইতেই পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ভয় নাই—অনন্ত কাল এ জীবন-লীলা থাকিবে না;—এক অবস্থায় পৃথিবীর কিছুই থাকিতে পারে না। সকলই ক্রম-বিকাশের অধীন, সকলেই উন্নতির যাত্রী। আজ আছি বলিয়া অনন্ত কাল এখানে এ ভাবে থাকিব না। আজ সীমার পূজা করিতেছি বলিয়া চিরকালই করিব না।

আবার অনন্ত কাল থাকিব না বলিয়া, আজই মায়া ছিন্ন করিতে পারি না। জীবন-মহাশাস্ত্র এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। এক ক্ষুদ্র জীবনেই কত উদ্দেশ্য—কত অনন্ত ভাব। অথবা ক্ষুদ্রই অনন্তের দর্পণ স্বরূপ। ক্ষুদ্র-বোধ আছে বলিয়াই অনন্ত-বোধ হইয়াছে—বিস্ময়পূর্ণ ভক্তিতে মানুষ পূর্ণ হইয়া, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, অনন্তে ডুবিতে ছুটিতেছে। ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লইয়া, সামান্য কর্ত্তব্য পালনের জন্য, অতি ক্ষুদ্র আমরা যে আজও রহিয়াছি, এ অনন্তের লীলা বই আর কিছুই নহে। অনন্তের লীলা প্রচার করিবার জন্য, নব সময়-সাগরে স্বচ্ছ বারিবিম্ব আবার মাথা তুলিল। যখন আশা কল্পনায় পরিণত হইবে—বিশ্ব-সৃষ্টির অনন্তত্ব বোধ হইবে—অনন্ত কর্ত্তব্যের প্রশস্ত দ্বার খুলিয়া যাইবে,—প্রেম-উদ্বেলিত হৃদয় যখন সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের চিন্তায় অবশ হইবে,—বুদ্ধি বা জ্ঞান যখন কূলকিনারা নির্ণয়ে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িবে;—কর্ত্তব্য-পালন যখন অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, তখন এ ক্ষুদ্র বারি-বিম্ব পুন অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে;—কেহ চিহ্নও দেখিবে না। ক্ষুদ্র শক্তি তখন অনন্তে মিলিবে,—এক তখন শত, শত তখন অনন্ত হইয়া যাইবে। যত দিন সে দিন উপস্থিত না হইতেছে, তত দিন আমাদের অস্তিত্ব অনিবার্য্য।

জাতিভেদ।

জাতিভেদ কোন না কোন আকারে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কোন দেশে ইহা বংশগত, কোথাও কর্ম্মগত এবং কোন কোন দেশে এই উভয় আকারেই বিদ্যমান আছে। ইউরোপীয় সমাজে সাধারণত কর্ম্মগত জাতিভেদ প্রচলিত, কিন্তু পিয়ারদিগের মধ্যে এখন উহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। যখন সমাজের সকল লোক এক অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃত সমাজ গঠিত হয় নাই, সেই আদিম অবস্থায় সকল দেশেই এক একটী মণ্ডলী ছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। যখন সমাজ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং কর্ম্মের বিভাগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িল, সেই সময় হইতেই জাতির সৃষ্টি হইল। প্রথমে যেমন ব্যবসায় অল্প ছিল সেইরূপ জাতির সংখ্যাও অল্প ছিল। ভারতবর্ষে কেবল চারিটী মাত্র ছিল। এই চারি মূল জাতি হইতে বর্ত্তমান "উনবষ্টি" জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। অনুলোম বিবাহ, প্রতিলোম বিবাহ, ব্যবসায়, গুণ ও ধর্ম্ম হইতে এই সমস্ত জাতির উৎপত্তি।

সমাজ গঠন করিতে হইলে, ব্যবসায় ও কর্ম্মের বিভাগ করা অনিবার্য্য। প্রথমে যখন ব্যবসায় বিভাগ হইবে, তখন তাহা বংশগত হইবেই হইবে। অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় আরম্ভ হইলে, তাহা এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর বা শাখার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, তখন বিনিময় হওয়া অসম্ভব। যদি এক একটী মণ্ডলী নিজ নিজ ব্যবসায় পুরুষানুক্রমে না করে, তাহার উন্নতি হওয়া কঠিন।

যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন ব্যবসায়ের বিনিময় ও স্বাধীনতা হইতে পারে। ভারতবর্ষে যখন আর্য্য জাতি আসিলেন, তখন তাহারা সকলে এক জাতি ছিলেন, এবং আদিম নিবাসীগণ একজাতি হইলেন। ক্রমে আর্য্যগণ আবার তিন জাতিতে আপনাদিগকে বিভক্ত করিলেন। এই তিন জাতির ভিতর প্রথমে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতির আধিপত্য বিস্তার হওয়ায়, ব্রাহ্মণকন্যাকে অন্য সকল জাতির বিবাহাধিকার রহিত হইল, কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণ অপর সকল জাতির কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন। প্রথমে এদেশে জাতিভেদের সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব ছিল না, উহা ধর্ম্মানুশাসিত ছিল না। যেমন অপরাপর উন্নত শ্রেণীর লোক অন্য সকল লোককে আপনাদিগের অধীনে রাখিতে চেষ্টা করিত, ভারতবর্ষেও ঠিক সেইরূপ ছিল। রোমে যেমন প্লিবিয়ান ও পেট্রিসিয়ান দুই শ্রেণী ছিল, ভারতবর্ষেও সেইরূপ আর্য্য ও অনার্য্য। আর্য্যগণ আপনাদের বংশমর্য্যাদা রাখিবার জন্য কঠোর নিয়ম সকল করিলেন। নিজের শত শত দুষ্ক্রিয়ার কোন দণ্ড নাই, শূদ্রের সামান্য অপরাধের গুরুতর দণ্ড।

ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত এই সকল নিয়মশাস্ত্র আমাদের দেশে ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে পরিগণিত, সেই জন্য জাতিভেদ ক্রমে ধর্ম্মানুশাসিত হইয়া পড়িল। ঐ নিয়ম-শাস্ত্রের আর সংশোধন বা পরিবর্ত্তন হইবার উপায় নাই। উহাকে মানিতেই হইবে। তবে ইংরেজদিগের শাসনাধীনে কতকগুলি নিয়ম এখন অব্যবহার্য্য হইয়াছে। কাহাকেও কোন অপরাধের জন্য আর শারীরিক দণ্ড বিধান করিবার ক্ষমতা নাই। শূদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি কোন অপরাধ করিলে আর তাহার শিরশ্ছেদন, বা অঙ্গচ্ছেদন করিবার যো নাই। কেবল সামাজিক দণ্ড গুলি এখনও প্রদত্ত হইতে পারে। শূদ্র এখন ব্রাহ্মণের অপমান করিলে রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে হয়। এবং যদি কোন সামাজিক দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা থাকে, যথা প্রায়শ্চিত্তাদি, তাহা বিহিত হইতে পারে। কিন্তু যদি শূদ্র সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে অসম্মত হয়, ব্রাহ্মণদিগের তাহা বলপূর্ব্বক করাইবার ক্ষমতা নাই। ইংরেজ-জাতি ভারতে না আসিলে বোধ হয় আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রকারগণই এদেশের শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। কোন নিয়ম যে যুগব্যাপী হইয়া অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিতে পারে, ইহা আর কোন দেশে দেখা যায় না। রোমে আর এখন পেট্রিসিয়ান নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার কারণ বড় অধিক অনুসন্ধান করিতে হয় না। ব্রাহ্মণেরা এমনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, শূদ্রজাতি কেবল দাসবৃত্তি করিবে, তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিবার অধিকার নাই। তাহাদের শাস্ত্রবাক্য-উচ্চারণের অধিকার নাই। তাহাদের গৃহানুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, আর শূদ্রকে বলেন, "নমঃ নমঃ" বল। অনেক বিদ্যাভিমানীরাও ঐ "নম নম" বলিয়া থাকেন। অনেক সময় অশিক্ষিত, দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ, সাধু সুশিক্ষিত শূদ্রের উপর এই প্রকার আধিপত্য করিয়া থাকে। এখন যাহা কিছু সংস্কার হইয়াছে, তাহা কেবল ইংরাজদের প্রসাদে।

এখন ভারতবর্ষে পূর্ব্বের ন্যায় জাতি-ভেদ আছে কি না? আমরা এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারি—নাই। স্মৃতি শাস্ত্র সেই আছে, ব্রাহ্মণের পদ সর্ব্বত্র সেরূপ নাই। কতকগুলি মৃত ক্রিয়া কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় এবং তাহাতেই তাঁহাদের যাহা কিছু গৌরব রক্ষিত হইয়াছে। নতুবা এখন শূদ্র সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে, ব্রাহ্মণ বেদ জানেন না, শূদ্র তাহার অর্থ পর্য্যন্ত করিতেছেন। এখন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে শূদ্র বলিব না ব্রাহ্মণ বলিব? আর শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিব না শূদ্র বলিব? ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহা মহা সভাতে সভাপতির আসন লাভ করিবেন, কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ সে সভাতে প্রবেশ করিতেই পারিবেন না। শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এখন জাতির মর্য্যাদা নাই, কেবল গুণের মর্য্যাদা। পূর্ব্বের জাতিভেদে যে এখন আর বিশ্বাস নাই, তাহা এই কয়েকটী বিষয় দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে।

১। শাস্ত্রালোচনা সম্বন্ধে এখন জাতির বিচার নাই। শত শত শূদ্র এখন বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। কেহ কেহ বলিবেন যে, পূর্ব্বেও বিশ্বামিত্রাদি শাস্ত্রালোচনা করিতেন। কিন্তু সেরূপ লোকের সংখ্যা কত? অত্যন্ত বিশেষ অবস্থার ও বিশেষ কারণে পুরাকালে শূদ্র বেদাদি অধ্যয়ন করিতে পাইতেন, কিন্তু এখন ঐ অধিকার সকলেরই আছে এবং সমাজ তাঁহাদিগকে স্মৃতি-নিরূপিত দণ্ড বিধান করিতে অক্ষম। যাঁহারা এই জাতিভেদকে রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সম্প্রতি যে ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য এক খানি মাসিক পত্র প্রচার হইতেছে, তাহা একজন শূদ্র কর্তৃক সম্পাদিত এবং তাহার নিয়মিত লেখকদিগের মধ্যে ১৮ জন ব্রাহ্মণ এবং ৯ জন শূদ্র।

২। শূদ্র এখন শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ধর্ম্মনীতি রচনা করিয়া প্রচার করিলেন, এবং শিক্ষিত লোকেরা তাহার বিধানমত আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কত শূদ্র সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রণয়ন করিতেছেন।

৩। কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, যাঁহার যুক্তি সারগর্ভ, তিনি শূদ্র হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

৪। শূদ্র জমীদার, ব্রাহ্মণের নিকট কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পূর্ব্বকালে কর গৃহীত হইত না। ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের জন্য পূর্ব্বের রাজারা ভূমি ও ধনাদি দান করিতেন। এখন আমাদের ভূম্যধিকারীরা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি হরণ করেন এবং তাঁহাকে কেবল মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করেন। অনেকেই অবগত আছেন যে, শূদ্র ভূম্যধিকারীরা ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

৫। এখন ব্রাহ্মণ শূদ্রের কার্য্য করেন, শূদ্র ব্রাহ্মণের কার্য্য করেন, ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণও পতিত হন না এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণের অধিকার অপহরণ করায় দণ্ডিত হন না। ব্রাহ্মণ ভূমিকর্ষণ করিতেছেন, বাণিজ্য করিতেছেন, দাসত্ব করিতেছেন, কিন্তু পতিত হন না।

৬। খাদ্য বিচার ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। তবে প্রকাশ্যে কেহ সাহস করিয়া

অন্য জাতির সহিত আহার করিতে পারে না, কিন্তু তাহাতে আপত্তি নাই। শত শত লোক ইংরেজদিগের হোটেলে সকল প্রকার খাদ্য (ও অখাদ্য) ভোজন করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃত্রিম অনৈসর্গিক জাতিভেদ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া, স্বাভাবিক ও কল্যাণকর জাতিভেদপ্রথা অলক্ষিত ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজ কত দিন চলিতে পারে? অনিষ্টকর অত্যাচারমূলক কোন প্রথা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। আমাদের দেশের প্রাচীন জাতিভেদপ্রণালী এক্ষণকার ন্যায় অস্বাভাবিক ছিল না। তখন যাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারাই জ্ঞান ধর্ম্ম সমন্বিত ছিলেন; শূদ্রেরা অজ্ঞ পশুপ্রকৃতি বিশিষ্ট ছিল, সুতরাং তখন অন্যায় পূর্ব্বক কেহ উচ্চ পদ গ্রহণ করে নাই। শূদ্র জাতির তখন কোন গুণ ছিল না, সুতরাং তাহারা দাসত্ব বহিত। কিন্তু যে সকল শূদ্র জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইত, তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করাও হইত।

বংশগত জাতিভেদ সমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম বলিয়াই একজন চিরকাল ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারে না। "দুঃশীলোপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়" এই ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ, অস্বভাবিক, অনিষ্টকর মত কতকাল কার্য্যত প্রতিপালিত হইতে পারে? ইহা সমস্ত ধর্ম্মনীতি ও সমাজ-তত্ত্বের বিরুদ্ধ; মনুষ্য-স্বভাব কখনও ইহাকে সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য হিন্দুসমাজ এ মতকে অধিক দিন পোষণ করিতে পারে নাই। যত দিন রাজদণ্ডের ভয় ছিল, তত দিন দুঃশীল ব্রাহ্মণ পূজ্য ছিল। কিন্তু দণ্ডভয় এখন আর নাই, এখন বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্র পূজ্য হইতেছে এবং দুঃশীল দ্বিজ ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। বংশগত জাতিভেদ থাকিলে গুণের মর্য্যাদা থাকে না। ব্রাহ্মণ যদি দুঃশীল হইলেও মর্য্যাদা পাইতে পারে, তাহা হইলে সে ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিতে ও জ্ঞানার্জ্জনে বিরত হইতে ভীত হইবে না। যে আপনার প্রকৃতিকে নীচ করে, যে ব্যক্তি জ্ঞান ধর্ম্মার্জ্জনে বিমুখ হয়, সে আপনার কর্ম্মদোষেই আপনার মহত্ত্ব হারাইতেছে, প্রকৃতি তাহার প্রতিকূল, ধর্ম্মনীতি তাহার বিপক্ষ। যাহার মহত্ত্ব নাই, তাহাকে কেবল স্মৃতি-শাস্ত্র বলিয়াছে বলিয়া কি কেহ মহৎ করিতে পারে? জনসমাজ মৃত শক্তির দ্বারা কখনও চালিত হইতে পারে না। জীবন্ত নীতি ও ধর্ম্ম, সমাজের নেতা। বটবৃক্ষ যদি স্বজাতীয় উন্নতি লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে কে আদর করে? তবে কেহ এরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, এক এক বংশের এক এক প্রকার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সে কার্য্যের উন্নতি অধিক হয়, এবং সে বংশের লোক তৎকার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করে। এ যুক্তিতে কিছু সার নাই। জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা কোন বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে পারে না, ইহা সকলেরই পক্ষে সমান কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বভাবত জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে ব্যগ্র হয়, শাস্ত্রবিধি দ্বারা তাহাকে বাধ্য করিতে হয় না। যদি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোক কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে, তবে সকলের সে অধিকার থাকিলে যে সে প্রকার হইবে না কেন, তাহার কোন কারণ

নাই। ঈশ্বর কোন বিশেষ জাতিকে কোন বিশেষ শক্তি ও অধিকার দিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সকলে একই ইন্দ্রিয়, একই বৃত্তি ও একই ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কেবল পরিচালনার অভাবে কাহার শক্তিগুলি অপরিস্ফুট থাকে এবং সম্যক পরিচালনা দ্বারা কাহারও বা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কার্য্যত দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণের শাস্ত্রালোচনা ও জ্ঞানোপার্জ্জন ও সদাচার কুলধর্ম্ম হইলেও অনেক ব্রাহ্মণ তাহাতে হীন-কর্ম্ম, কিন্তু শূদ্রের পক্ষে ঐ সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অনেক শূদ্রকে শাস্ত্রজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাগার দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে শাস্ত্রানুশীলন অথবা বাণিজ্যাদির বদ্ধভাব নাই। তথায় জ্ঞানোন্নতির পক্ষে কোন প্রকার ব্যাঘাত দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং স্বাধীনতা থাকায়, অধিক উন্নতি হইতেছে। অল্পলোকের মধ্যে কোন কার্য্য বদ্ধ থাকিলে তাহার উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

জাতিভেদ সেই জন্য জ্ঞান ধর্ম্মোন্নতিমূলক হওয়াই স্বাভাবিক। যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত হইবেন, তিনি সেইরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি যদি গুণহীন হন, তিনি ব্রাহ্মণত্ব হারাইবেন এবং শূদ্রাদিরাও যদি গুণবিশিষ্ট হন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই প্রণালীতে এখন সমাজ চলিতেছে। কেবল বিবাহ ও ভোজনাদিতে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গুণহীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা গুণান্বিত শূদ্র সমাজে অধিক সম্মান পাইয়া থাকেন। ধর্ম্মনীতির উচ্চতম আদর্শে সমাজ সংগঠিত না হইলে, সে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। স্বার্থপরতা দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত, তাহার পরিণাম দুঃখ। উচ্চতম ধর্ম্মনীতির আদর্শ কোন সমাজেই সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্ম, সকল পদার্থ ও প্রাণীকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া প্রচার করে,* কিন্তু কার্য্যকালে এই মত সমাদৃত হয় না। জাতিবিশেষকে স্পর্শ করিলে হিন্দুগণ আপনাদিগকে অশুচি মনে করেন, এমন কি, তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান করা বিধেয় বলা হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করিতে আদেশ করে, কিন্তু খ্রীষ্টানেরাই আফ্রিকা ও আমেরিকাতে দাস ব্যবসা করিত এবং এখানে৷ ভারতবর্ষে আমাদিগকে কোনও বিষয়ে সমান অধিকার দিতে প্রস্তুত নহে। স্বার্থপরতাতে মনুষ্য অন্ধ হইয়া, অন্যের অধিকার অপহরণ করে। অতএব দেখা যায়, যদিও মতে আমরা জাতিভেদ অস্বীকার করি, কিন্তু কার্য্যে তাহা কোন কোন স্থলে রক্ষা করিয়া থাকি। যাঁহারা সকল মনুষ্যকে ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের সন্তান বলেন, তাঁহারাও সকলকে সমান অধিকার প্রদান করেন না। আমরা যদিও নিকৃষ্ট জাতির শিক্ষিত লোকদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করি, কিন্তু ঐ সকল জাতির লোক যদি অশিক্ষিত হয়, অথবা যদি নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে আর তাহাদের সহিত উপবেশন করি না। একজন সূত্রধর বা গোপ, অথবা রজক যদি ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে

* নবজীবন—বৈশাখ—১২৯২—"সোহং" প্রবন্ধ দেখ।

কোন উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়, আমরা তাহার সহিত সভাতে একত্রে উপবেশন করিয়া থাকি, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষা না পাইয়া থাকে, অথবা গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন উচ্চপদ লাভ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত উপবেশন করা দূরে থাকুক,তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাও কহি না। ভৃত্যের সহিত কেহ একাসনে উপবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন না, একজাতি হইলেও তাহার সহিত আহারাদি করেন না।

আমরা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, তদ্দারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে—

১। যাঁহারা জ্ঞান ধর্ম্মোপার্জ্জন দ্বারা আপনাদিগকে সমুন্নত করিবেন, স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহারা সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিবেন। তাঁহারা যে বংশ বা জাতি হইতে উৎপন্ন হউন, তাঁহাদিগের গুণের মর্য্যাদা করিতেই হইবে।

২। যাঁহারা গুণবিশিষ্ট হইতে পারিবেন না তাঁহারা সে মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ভদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া কেহ তাঁহাদিগকে সমাজে উচ্চাসন দিতে সম্মত হইবে না।

৩। শাস্ত্রের ব্যবস্থা যদি অন্যায় হয়, তাহা লোকে কাযাকালে প্রতিপালন করে না। শাস্ত্রে শূদ্রাদির বেদ পাঠ নিষেধ কিন্তু লোকে তাহা অগ্রাহ্য করিতেছে। শাস্ত্রকারেরা বিশেষ বংশের যে বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও ব্যবসা নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন,লোকে তদনুসারে চলিতেছে না।

৪। কার্য্য বিষয়ে স্বাধীনতা আবশ্যক। যাহার যাহা ইচ্ছা,তিনি সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবেন; যাঁহার যেরূপ অভিরুচি,তিনি সেইরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিতে অধিকারী হইবেন।

৫। সকল নিয়মের যেমন পরিবর্ত্তন হয়, আমাদের স্মৃতি ও অন্যান্য ব্যবস্থা শাস্ত্রেরও সেইরূপ সংশোধন হওয়া আবশ্যক। সমাজের যেমন উন্নতি হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কোন শাস্ত্র অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না।

এখন আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি যে, যখন জাতিভেদ প্রথাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, এবং কার্য্যতঃ তাঁহারা প্রাচীন প্রথা সকল পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন প্রকাশ্যে কেন আপনাদের বিশ্বাস জ্ঞাপন না করেন। আমাদের প্রাচীন নিয়ম সকলের সংস্কার করিবার জন্যও উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের দেশের জাতিভেদ ধর্ম্ম শাস্ত্রানুগত, এবং তাহা প্রতিপালন না করিলে ধর্ম্মাংশে পতিত হইতে হয়। এইরূপ কঠোর নিয়ম থাকায় লোকে সহসা তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু কেহ বিশ্বাস করেন না যে, ইংরেজদিগের অন্ন গ্রহণ করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়,অথবা অন্য জাতির সহিত বিবাহ প্রচলিত করিলে নরকস্থ হইতে হয়। কিন্তু কেহ সাহস করিয়া সেই প্রাচীন প্রথা সকল প্রকাশ্যে উল্লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। গোপনে সকল কার্য্যই হইতেছে। কিন্তু এই কপটাচরণ দ্বারা সমাজের বিষম অনিষ্ট হইতেছে। ইহা দ্বারা লোকের ধর্ম্মনীতি দূষিত, মানসিক সাহস খর্ব্ব, কুক্রিয়া বৃদ্ধি,এবং জাতীয় চরিত্র কলুষিত হইতেছে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

নববর্ষ।

(১)

আয় আয়, মৃত প্রাণ, আমার অন্তরে,
আয় আয় অনন্ত-মন্দিরে।
বহিছে সুসমীরণ,
ছুটিছে নক্ষত্রগণ,
আয় আয় অনন্তে ছুটিয়া,
আয় আয় মৃত প্রাণ, আঁধার ছাড়িয়া।
বসন্ত আমার সাথে;
শরত্ মিলিবে পথে,
শিশির, বরষা, মেঘ মিলিবে কালেতে,
আয় আয় মৃত প্রাণ! পরাণ লভিতে।

(২)

ধীরে ধীরে ডাকি, আয় আয় আয়,
তেজিয়া মরণ, প্রাণ! আয় আয় আয়;
নবীন আলোক আমি,
নবীন পুলক আমি,
নবীন প্রাণের সিন্ধু আমার অন্তরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে আজি আইনু সংসারে।
নব আশা, নবতৃষা,
নবীন নবীন উষা,
চাহিলেই পলকে মিলিবে;
পুরাণ ভুলিয়া যাও,
পুরাণে বিদায় দেও,
পুরাণ ভাবিয়া কি হইবে?
আয় আয়, নবীন আহরে।
থাকিওনা, থাকিওনা মরণে মরিয়া,
ডাকিতেছি যতন করিয়া:
আমি গেলে ফিরিব না আর,
আমি গেলে কি হইবে তোর!

(৩)

মর নাই,—কেবল মূর্চ্ছিত,
তুই চিরদিন অক্ষয় অমর।
বিস্মৃতির বশে আপনা ভুলিয়া,
কাল-সিন্ধুনীরে রহিলি পড়িয়া।
যাহা গেল, তাহা তোর নয়,
যাহা নীল কাল, তাহা কিছু নয়;
অশোক, অজড়, অমর, অব্যয়,
ধ্রুব নিত্য তুমি, তুমি আত্ম-ময়।
একটীও ক্ষত নাই তোমার অন্তরে,
তবুও পড়িয়া কেন মৃত্যুর আঁধারে?
দেব আশা, দেব তৃষা,
দেবের অনন্ত ভাষা,
আছে নাকি সুষুপ্ত অন্তরে?
—তাই ডাকি অনন্ত-মন্দিরে!

(৪)

ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনোরথ লইয়া বুকের কোলে,
রহিলি পড়িয়া তুই অনন্ত-মৃত্যুর ঘরে!
মরা মরা আশাগুলি, রাখিয়া কি হবে আর,
আর তো জীবিত নাই, আর কি হইবে তোর?
মৃত শব বুকে করি, কেন ভাস অশ্রু জলে?
একেলা বসিয়া আছ বিষাদের উপকূলে!
অতীত সিন্ধুর জল কল্লোলিয়া যায় ওই,
ভাসাও গলিত শব, ভাসাও প্রাণের ধন!
মৃত্যুর নিশ্বাস বিষ, লাগিলে মরিবি তুই,
দেও দেও ভাসাইয়া হারাধন, হারাজন!
আপনার বাড়ীঘর কোথায় ফেলিয়া দূরে,
বাধিয়া শোকের ভার, ডুবিবি অগাধনীরে?
আছে দূরে ভবিষ্যত,
আছে দূরে মনোরথ,
কাঁদিওনা, ডুবিওনা, আয়রে আপন ঘরে,
অনন্ত-মন্দিরে যাহা, সকলি সঁপিব তোরে।

(৫)

আজি ধন্য আমি বিধাতার বরে,
লও লও যাহা আছে আমার অন্তরে,—

নব নব আশা, নব নব তৃষা,
নব নব আকাশের উষা;
নবীন প্রভাতী, নবীন ঝঙ্কার,
নব নব গতি, নবীন সংস্কার;
নবীন তরঙ্গ,—প্রাণের উদ্দাম,
নব নব সিন্ধু,—প্রাণের বিরাম।
নবীন জগত,
নব ছায়া পথ,
নব নব লক্ষ্য স্থ প্রভাত;
নব রণতরী,—বিজয়ী নিশান,
নব তোপধ্বনি,—বিজয়ী সঙ্গীত;
নব জয় মালা,—শির-সুশোভন,
নব নব জ্যোতি, উৎসাহে জ্বালিত।
নব তীর্থ, নব মাঠ,
নব নব পুণ্য তট,
নব নব পুণ্য অবগাহ;
নব কল্পতরুকুল, নব মন্দাকিনী,
নব নব অকথিত অনন্ত কাহিনী।

(৬)

আজি ধন্য আমি বিধাতার বরে,
লও লও যাহা আছে আমার মন্দিরে;—
নবীন নয়ন, নবীন কিরণ,
নবীন সন্ধান, নবীন মিলন;
নবীন প্রণয় কথা,
নবীন প্রণয় ব্যথা,
নব মোহ মায়া ভয়, নবীন বন্ধন,
নবীন আলোক, নবীন আঁধার,
নবীন কৌতুক স্রোত,—অনন্ত অপার।
নবতরু, নবলতা, নবীন শৃঙ্খল,
নবীন বিবাহ-গীতি উৎসব মঙ্গল।

৭

উড়িছে ভারতী বীনা,
নবীন কবি-কল্পনা,
নব নব কাব্যের স্মরণ;
নব বেদমাতা, নব বেদ গান,
নব নব ছন্দ ভাবের ধরাণ;
নবীন রমণী কাব্যের সৃজন,
নব পুণ্য ক্ষেত্র অনন্ত বর্ণন;
নব কুঞ্জ শোভা ওই,
নব শ্যাম আভা ওই,
নবীন কালিন্দী তট নবীন বাঁশরী,
নব নব্যভারতের অমৃত লহরী।

৮

আয় আয় ক্ষুদ্র প্রাণ! আয় রে অনন্ত ঘরে
কত যে কি দিব তোরে, কে আজি বলিতে পারে!
অনন্ত ভাণ্ডার আছে,
অক্ষয় জীবন আছে,
এর চেয়ে বড় কিছু আছে কি মৃত্যুর ঘরে?
তড়িতের স্রোত ধরি ঢালি দিব তোর হৃদে,
অক্ষয় অনন্ত স্তম্ভ উড়িবে বিমান পথে।
কত সুমঙ্গল ধ্বনি,
কত মহা মহা বাণী,
শুনিয়া শুনিয়া তুই চলিবি আপন পথে;
মহা মহা জীবনের অমৃত লহরী,
মহা মহা জগতের অনন্ত কাহিনী।

৯

নূতন করিয়া তোরে রাখিয়া যাইব আমি,
নূতন আলোকে বিশ্ব আবার লভিবে তুমি,
নব তিথি পক্ষবার,
কাল চক্র অনিবার,
শুভ রাশি শুভ তারা,
শুভ চন্দ্র, শুভ ধরা;
শুভ দিন, শুভ সংবৎসর,
শুভ শুভ গ্রহের সঞ্চার।
সকলি আনিয়া দিব,
সকলে ডাকিয়া দিব,
তবু কেন নেহারিয়া বিষাদে অতীত পানে?
মিলিল নবীন জন্ম আজি নব শুভক্ষণে।

১০

যদি বা অতীত পানে চাহিতে বাসনা তোর,
তাহাও আমাতে আছে তাহাও হইবে তোর।
মোদের "অতীত" যাহা মরণে সঁপিয়া গেল,
সে গাণ্ডীব সে তূনীর আছে ঘরে সমুজ্জল।
সেই ভীষ্ম, সেই দ্রোণ, সে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির,
সেই কবি, সেই গাথা, অক্ষয় অমৃতনীর।

১১

দেখরে চাহিয়া তোর আঁধার ভবন পানে,
কি শোভা ফুটিয়া আজি মরুময় সে শ্মশানে,
কুসুম পল্লব কত, রহিল ফুটিয়া দ্বারে,
মঙ্গল কলসী কত চলিল ডাকিতে তোরে,
পথে ঘাটে মাঠে ফুল,
প্রাণে আজি ফোটে ফুল,
কাঙ্গাল দরিদ্র ধনী আনন্দে বিহ্বল,
ছুটিছে তরঙ্গে রঙ্গে প্রাণের কল্লোল।
আছে লোক দ্বারে দ্বারে,
বরিয়া লইতে মোরে,
চারি দিকে দেব-আত্মা অজ্ঞাত ছুটিয়া যায়,
আমি যে আইনু ঘরে, কোথা তুই, আয় আয়।

১১

আয় আয় আজি জীব! আয়রে অনন্ত-ঘরে,
কোটী কোটী কোটী চন্দ্র-কিরণে তোষিব তোরে
বিদ্যুৎ ধরিয়া আজি রাখি দিব পথে পথে,
সোণার সংসার কত ফুটিবে অনন্ত-পটে।
নব নব দ্রব্য গুণ উপহার দিয়া,
বিশ্ব-বক্ষ দিব সাজাইয়া;
প্রকৃতি-রহস্য-তত্ত্ব যেখানে যা পাই,
যতন করিয়া আনি দিব তোর ঠাঁই;
নবীন সংযোগ কথা,
নবীন বিজ্ঞান-প্রথা,
নব নব বিশ্লেষণ, নব সমবায়,
দিক কাল ক্ষিতি তত্ত্ব চেতনা-নিলয়।
বহু শক্তি একটী করিয়া,
তড়িত আলোক তাপ একে মিলাইয়া;
একটী তরঙ্গ,—ইথারের গতি,
একটী প্রবাহ, একে অনুভূতি,
এক ধাতা, এক বিশ্ব, একটী সংসার,
একতা পরম ধর্ম্ম করিব প্রচার।
নিস্তব্ধ সুদূর হতে,—ব্যোমের অন্তরে,—
একটী কিরণ ধরি আনিব সংসারে,
বুঝি সেই আলোবিন্দু পশেনি ধরায় আর,
বুঝি সেই দেবদূত আইল লইয়া,
একটী তারার বাণী অনন্ত-অম্বরে।
আহা! এ মিলন আমার লাগিয়া,
আহা! কত তারা ফুটিয়া,
কালের সঙ্গীতে বিমান-পথে!
আকাশ হাসিল আজি মিলিতে ধরার সাথে,
কোথা তুই, আয় আয়, মিলাই, বিশ্বের-চিতে।

১২

ভবিষ্যৎ দূত আমি,
কাল-স্রোতে আইনু সংসারে,
বহিয়া অনন্ত বাণী অনন্ত বারতা;
খুলি দিয়া যাই অনন্ত-মন্দির,
গাহিয়া গাহিয়া অনন্ত সঙ্গীত;
অনন্ত সাগর, অনন্ত প্রদেশ,
আছে নাকি তোর লাগিয়া কোথায়?
আয় আয় ক্লান্ত জীব তবে আয় আয়।
চলিতেছি পথ দেখাইয়া,
আয় আয় চকিত হইয়া;
জীব জন্তু পশু পক্ষী জানে না যে দেশ,
চল যাই লভিতে সে দেশ।
চন্দ্র সূর্য্য যেথা যায়,
গ্রহ তারা যেথা লয়,
দিক্ কাল ক্ষিতি ব্যোম যেথাহে বিলয়,
চল সেই অজ্ঞাত আলয়!—
—মহাতীর্থ, মহাধাম মহাপরস্থান!
মিলিবে অনন্ত বাণী, অনন্ত নির্ব্বাণ!

শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন।

আমাদিগের বিবাহ প্রণালী।

প্রথম অবস্থায় আর্য্য-সমাজে কোন রূপ বিবাহ প্রথা ছিল না। নর নারীগণ পশুবৎ ব্যবহার নিরত ছিল। মহাভারতে লিখিত আছে—"পূর্ব্বকালে রমণীগণ অবারিতা ছিল, তখন তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া সম্ভোগ সুখাভিলাষে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। তাহারা কৌমার কাল অবধি ব্যভিচারে রত থাকিত. তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। কারণ ইহাই সেই সময়ের সনাতন ধর্ম্ম ছিল। (স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ)। অল্প কাল হইল এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" এই পরিবর্ত্তন উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু দ্বারা হইয়াছিল। একদা শ্বেতকেতু তাহার পিতা মাতার সহিত আসীন ছিলেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতাকে লইয়া গেল। পুত্র মাতাকে অন্য পুরুষের সহিত গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পিতা পুত্রকে বলিতে লাগিলেনঃ—

"মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ ॥

অর্থ।—বৎস রাগ করিও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে সর্ব্ব বর্ণের অঙ্গনাগণ অবারিত। হে তাত! গো গণের ন্যায় প্রজাগণও স্ব স্ব বর্ণে ব্যবহার করিয়া থাকে।

শ্বেতকেতু পিতার বচনে শান্ত না হইয়া বলিলেন, এইরূপ প্রথাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। অদ্য হইতে যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া অন্য পুরুষে অনুরক্ত হইবে, ভ্রূণ-হত্যা রূপ মহাপাতক তাহাকে স্পর্শ করিবে।

ইহাদ্বারা একরূপও বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, মহর্ষি শ্বেতকেতুর দ্বারা সর্ব্ব প্রথম আর্য্য-সমাজে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আধুনিক পণ্ডিতগণ বিবাহ শব্দের অনেক অর্থ করিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন কালে ইহার অর্থ অন্যরূপ ছিল। স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সহবাসে সম্মত হইয়া স্ত্রীর অভিভাবকের জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাত মতে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইত বলিয়া ইহার নাম বিবাহ বা পরিণয় হইয়াছিল।* সমাজের কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতির পর যে বিবাহ প্রথা প্রথমাবস্থায় প্রচলিত হয়, তাহাই উত্তর-কালে "গান্ধর্ব্ব" ও "রাক্ষস" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন কার্য্যই এক কালে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। বিবাহের ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় ও সেই রূপ কুদৃশ্য। কোন পুরুষ কতকগুলি স্ত্রীকে বিবাহ করিতেন। আবার কোন কোন স্ত্রী ও কতকগুলি পুরুষকে বিবাহ করিতেন। কোন কোন মহাত্মা অন্য রমণীকে হৃদয়ে স্থান দান করিতে অক্ষম হইয়া সহোদরাকে বিবাহ করিয়া ফেলিতেন। মাতুল, পিতৃ-স্বসা প্রভৃতির কন্যা বিবাহের কোন বাধা ছিল না।

ঋগ্‌বেদ প্রথম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে পুরুষের বহু বিবাহের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক স্ত্রীর সহিত বহু পুরুষের বিবাহের

* অদ্যাপি কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই রূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

সামান্য প্রমাণ ঐ বেদের ১১৯ সূক্তের পঞ্চম ঋকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতে এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ আছে, "প্রচেতা" নামে দশজন ঋষি ভ্রাতা এক মুনী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জটিলা নামে গৌতম গোত্রীয়া ধর্ম্ম-পরায়ণা এক তাপসী সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতাভগ্নীতে বিবাহের কথা হিন্দুদিগের লিখিত কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ যখন ইহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তখন এ প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকন্তু বৌদ্ধদিগের লিখিত গ্রন্থে এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাহার দুই একটী এ স্থলে উল্লেখ করিব। সিংহল দেশীয় ইতিহাস "মহাবংশে" লিখিত আছে যে, বিজয় সিংহ নামে যে বাঙ্গালি প্রায় ২৪ শত বৎসর পূর্ব্বে সিংহল দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহার জনক জননী এক পিতামাতার সন্তান।*

ব্রহ্ম রাজ বংশের ইতিহাস "মহারাজোয়াং" গ্রন্থে শাক্য বংশের ইতিহাস বর্ণনায় লিখিত আছে, কপিলবাস্তুর স্থাপয়িতা—(কাশীরাজার) ৪ জন রাজ পুত্র তাঁহাদিগের সহোদরাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন।†

প্রাচীন শাসন পত্রানুসন্ধান করিতে যাইয়া সে দিবস আমরা দেখিলাম যে, খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীতেও জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তাহার মাতুল কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এই প্রথাটী অদ্যাপি মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত আছে।

আর্য্যজাতির উন্নতির প্রথমাবস্থায় বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, তথাপি পশুবৎ ব্যবহার লোপ হইতে পারে নাই। অসাধারণ জ্ঞানী পূজ্যপাদ আর্য্য-ঋষিগণের পাশবাচারের কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় সাধারণের অবস্থা যে কি ভয়ানক ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পশুবৎ ব্যবহার দ্বারা যে সকল সন্তান হইত তাহারা অনিন্দিতভাবে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ প্রপাটক চতুর্থ খণ্ডে লিখিত সত্যকামজাবাল ঋষির জন্ম বিবরণ ইহার একটী বিশেষ প্রমাণ। কানদ, বশিষ্ঠ, দ্বৈপায়ন, শুক, দীর্ঘতমা প্রভৃতি ঋষিগণের জীবনচরিতই আমাদের বাক্যের পোষণোপযোগী প্রমাণ। বিশেষত কৌমার্য্যাবস্থায় যে সকল স্ত্রী লোক ব্যভিচার দ্বারা সন্তান প্রসব করিতেন, পুনর্ব্বার তাহাদের বিবাহ হইত। মৃচ্ছকটিক নাটক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বেশ্যা বিবাহ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বৈদিক কালে বিধবা বিবাহে কোন রূপ আপত্তি ছিল না ‡। বরং বিধবাদিগকে

* টর্ণার সাহেব প্রকাশিত মহাবংশ।

† ফেয়ার সাহেব লিখিত ব্রহ্মরাজ বংশের ইতিহাস।

‡ বৈদিক কালে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার প্রমাণ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের একটী প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

"A younger brother of the dead, a disciple, or a servant, should then proceed to the pyre, hold the left hand of the woman, and ask her to come away, saying "Rise up woman thou liest by the side of the lifeless; come to the world of the leaving, away from thy husband and become the wife of him who holds thy hand and

পর পুরুষ সংযোগে সন্তান লাভ করিবার জন্য ও আত্মীয়গণ অনুমতি প্রদান করিতেন। ধনী ব্যক্তিগণ স্বয়ং অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইলে অন্যকে ধন দ্বারা কিম্বা বিনয়ে বাধ্য করিয়া স্বীয় স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করাইতেন।

উপনিষদের সময়েই আর্য্যদিগের প্রকৃত উন্নতি। বোধ হয়, এই সময়েই ব্যবস্থা-শাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। মনু আট প্রকার বিবাহ ও দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্ব পক্ষে অধম পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ।*

১। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আহ্বান ও অর্চ্চনা-পূর্ব্বক বসনাচ্ছাদিত কন্যাদান করাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলা যায়।

২। কন্যাকে বসনালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া, যজ্ঞেবৃত পুরোহিতকে যজ্ঞ সম্পাদন কালে দান করিলে দৈব বিবাহ বলে।

৩। বর হইতে ধর্ম্মার্থে এক বা দুই গো মিথুন (গাভী ও বৃষ) গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান করিলে তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে।

৪। তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন কর, এই কথা বলিয়া কন্যাদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।

৫। কন্যার ও তাহার পিতা প্রভৃতিকে সাধ্যানুসারে ধন দ্বারা বিবাহ করিলে তাহাকে আসুর বলা যায়।

৬। বর ও কন্যার ইচ্ছানুসারে পরস্পর সম্মিলনের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এই সম্মিলন কামাসক্ত ভাবে হইয়া থাকে।

৭। বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলে তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

৮। নিদ্রাভিভূতা, মদ্য পানে বিহ্বলা

---

is willing to marry thee."* * * That the remarriage of the widows in vedic times was a national custom can be well established by a variety of proofs and arguments, the very fact of the Sanscrit language having, for ancient time such words as *didhishu* "a man that has married a widow" *Parapurva* "a woman that has taken a second husband" *Punarbhava*, "a son of a woman by her second husband" are enough to establish it. Dr Rajendra Lall Mittra's Funeral Ceremonies of the ancient India."

* ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥
মনু ৩। ২১॥

১। আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মনু ৩।২৭।

২। যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥
মনু ৩। ২৮।

৩। একং গো মিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥
মনু ৩। ২৯॥

৪। সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।
মনু ৩।৩০।

৫। জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥
মনু ৩।৩১।

৬। ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কাম সম্ভবঃ॥
মনু ৩।৩২।

৭। হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥
মনু ৩।৩৩।

৮। সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥
মনু ৩।৩৪।

অথবা অনবধানেতা যুক্ত রমণীকে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ বিবাহ।

৯। ভগবান মনু কেবল ক্ষত্রিয় জাতির জন্য আর একটী বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম মিশ্র-গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস। (৯) সুতরাং মনু যে সময়ে ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তখনও তিনি অনেক বাদ দিয়া ৯টী বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মনু বলেন, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব, এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মজনক; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ ধর্ম্মজনক; বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহ ধর্ম্ম জনক। যে সমাজের ব্যবস্থা কর্ত্তা রাক্ষস ও পৈশাচের ন্যায় কদর্য্য বিবাহকেও ধর্ম্ম জনক বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সমাজের অবস্থা যে কত দূর শোচনীয় ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে না।

মনু, গান্ধর্ব বিবাহের প্রতি একটুকু বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট বিবাহ, শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের, শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির, গান্ধর্ব প্রণালীতে বিবাহ হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, স্ত্রী ও পুরুষের হৃদয় ও মনের যে মিলন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ, যদি ইহাই ঠিক হয়, তাহা হইলে গান্ধর্বকেই প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে "সর্ব্ব প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ।"

অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার ও কৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর পরিণয় মিশ্র গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস প্রণালীতে হইয়াছিল। বীরচূড়ামণি ভীষ্ম কাশীরাজার কন্যা অম্বা ও অম্বালিকাকে হরণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কর্ণ অনেকবার বিবিধ দেশের রাজকন্যাকে হরণ করিয়া দুর্য্যোধনের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল বিবাহকে রাক্ষস শ্রেণীতে গণনা করা যাইতে পারে। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে আর এক প্রকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বর—দুই প্রকার। কতকগুলি বর এক সভায় উপস্থিত হইতেন, কন্যা তন্মধ্যে একজনকে স্বীয় পতিত্বে নির্ব্বাচন করিতেন। ইহাও এক প্রকার গান্ধর্বই বটে। দ্বিতীয় প্রকার স্বয়ম্বরে কোন একটী পণ থাকিত, বিবাহার্থিদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পণানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেন, কন্যা তাহাকেই বরণ করিতেন। এই নিয়মানুসারে সীতা ও দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়াছিল।

ভগবান মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী মহাভারত-কর্ত্তাও দ্বাদশবিধ পুত্রের বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন। তাহাও এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। স্বীয় পরিণীতা পত্নীতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে ঔরস বলে। পুত্র শ্রেণীতে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। (মনু ৯।১১৬।)

২। পুত্রহীন মৃত ব্যক্তির, নপুংসকের কিম্বা শক্তিহীন ব্যক্তির স্ত্রী, ধর্ম্মানুসারে নিযুক্ত হইয়া অন্যের দ্বারা যে পুত্র উৎপন্ন করে, তাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে। (মনু ৯।১৬৭।) ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডুপুত্রগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৩। স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির পুত্র-

হইল না বিবেচনা করিলে, নিয়োগ শাস্ত্রজ্ঞ মুনীগণ বিধবা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দিয়াছেন। * কিন্তু মহাভারতে দেখা যায়, এই ঘৃণিত নিয়োগ প্রথানুসারে বীর পত্নী সারদণ্ডায়ণী এক ব্রাহ্মণ দ্বারা তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। † বলি রাজ পত্নী এই বিধি অনুসারে নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘতমা নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পৌণ্ড্র ও সুহ্ম নামে ৫ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ‡ পাণ্ডু রাজ-পত্নী কুন্তি এই বিধি অনুসারে জগদ্বিখ্যাত তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং নিয়োগ প্রথা যে প্রাচীন কালে বিশদ রূপে প্রচলিত ছিল, এবং দুইটীর অধিক সন্তান উৎপাদন করা হইত, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

মনু আর দুই একটী শ্লোক পরেই লিখিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুত্রোৎপাদনার্থ বিধবা রমণীকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিবেক না, করিলে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়।" মনু পূর্ব্বে নিয়োগের বিধি দিয়াছেন। এবং তদনুসারে আর্য্যসমাজ বিশেষ রূপে নিয়োগ প্রথা প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু বংশোদ্ধার মানসে মহিষী সত্যবতী ভীষ্মদেবকে তাহার ভ্রাতার বিধবা পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিতে অনুরোধ করেন, সেই সময় অসাধারণ জ্ঞানী ধার্ম্মিক চূড়ামণি গাঙ্গেয় বলিয়াছেন "মাত! আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ধর্ম্ম বটে, কিন্তু আপনার জন্য আমি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে লঙ্ঘন করিতে পারি না। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধন দ্বারা বাধ্য করুন; তিনি বিচিত্র বীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবেন।" এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, নিয়োগ প্রথার উন্মূলন-কারী শ্লোক পশ্চাৎ মনু সংহিতায় সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসীগণ হয়ত কুল্লুক ভট্টধৃত বৃহস্পতির বচন অবলম্বন করিয়া বলিতে পারেন যে, ভগবান মনু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের জন্য নিয়োগ প্রথা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কলিকালের জন্য তিনি ইহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ তর্ক না করিয়া ইহাই বলিতে পারি যে, প্রাচীন কালে এই ঘৃণিত প্রথা আর্য্য-সমাজে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এবং বোধ হয় মনু সংহিতার সঙ্কলন কর্ত্তা মহর্ষি ভৃগু এই ঘৃণিত বিধির প্রতিরোধ মানসে বিরুদ্ধ উক্তি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

মনু সংহিতা হইতে আমরা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, ইহা দ্বারা তদানীন্তন সমাজিক চিত্রের প্রতিবিম্ব পাঠকগণের হৃদয়ে সামান্য আকারে পতিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। প্রাচীন সময়ের পরিবর্ত্তনে পরবর্ত্তী সময়ে তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল, সুতরাং অন্যান্য ঋষিগণ মনু সংহিতার কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন ব্যবস্থা শাস্ত্র লিখিতে লাগিলেন, আমরা সেই সকল আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এস্থলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব।

ঋষি প্রবর অত্রি, বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ

---

* মনু সংহিতা। ৯। ৬০, ৬১ শ্লোক।

† মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়।

‡ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল একটী শ্লোক বলিয়াছেন যে—

"ক্রয় ক্রীতা চ কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতস্তেষাং পিতৃ পিণ্ডং ন বিদ্যতে ॥"

এত দ্বারা মহর্ষি অত্রি মনু কথিত আসুর বিবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ভগবান বিষ্ণু স্বীয় সংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা —"ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব আসুরো রাক্ষসঃ পৈশাচ শ্চেতি।" বিষ্ণু মনুর পদানুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং মনু বিবাহ সমূহের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি বিষ্ণু বাল বিধবার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন।

"অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ।"

অর্থাৎ অক্ষত যোনি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে। (বিষ্ণু সংহিতা ১৫। ১৭।)

বিষ্ণু ঋষি মনুর ন্যায় দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের বর্ণনায় কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। মনু পৌনর্ভব (অর্থাৎ বিধবার পুনর্ব্বিবাহ জাত) পুত্রকে নিকৃষ্ট বা দশম স্থানীয় লিখিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণু বলেন ঔরস প্রথম, ক্ষেত্রজ দ্বিতীয়, পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়, পৌনর্ভব চতুর্থ, কানীন পঞ্চম, গূঢ়োৎপন্ন ষষ্ঠ, সহোঢ় সপ্তম, দত্তক অষ্টম, ক্রীত নবম, স্বয়ং উপগত দশম, অপবিদ্ধ একাদশ, পারশব দ্বাদশ। "এতেষাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেয়ান" অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্র পরবর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু বিধবার পুনর্ব্বিবাহজাত পুত্রকে উপরে উঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি তাহার উপযুক্ত স্থান হয় নাই। কারণ ঔরসের পরেই ইহার স্থান দান করা উচিত। মহাভারতে তাহাই হইয়াছে। ভীষ্ম-পর্ব্বে লিখিত আছে—"নাগরাজ ঐরাবতের এক কন্যা ছিল। সুপর্ণ কর্ত্তৃক সেই কন্যার পতি হত হইলে, নাগরাজ ঐ দুঃখিতা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলে, পার্থ তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন। নাগরাজ কন্যার গর্ভে অর্জ্জুনের যে পুত্র হইয়াছিল, মহাভারতকার তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে "পুত্রমৌরসম" লিখিয়াছেন। ঘৃণিত ক্ষেত্রজ পুত্র অপেক্ষা যে এই প্রকারের পুত্র কতদূর শ্রেষ্ঠ, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে। অধিকন্তু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেনঃ—

"অক্ষতা বা ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
(১ম অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক।)

অর্থাৎ "অক্ষত কিম্বা ক্ষত যে রমণী, তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে।" সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

উশনা ও অঙ্গিরা বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই, সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতে বিনা বাক্যে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

মহর্ষি গর্গ বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। কারণ তিনি বিবাহে কন্যার বয়ক্রম সম্বন্ধে অতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন।

ঋষিপ্রবর আপস্তম্ব বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সম্বর্ত্ত ও কাত্যায়নও ঐরূপ।

বৃহস্পতি সংহিতায়ও বিবাহ সম্বন্ধে কিছু লিখিত হয় নাই।

ত্রেতাযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৌতমঋষি দায়ভাগ প্রকরণে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পৌনর্ভব পুত্রের ধনাধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভগবান বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—"যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য অন্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি।"

বশিষ্ঠ সংহিতা—১৭ অধ্যায়।

অর্থাৎ যে স্ত্রী ক্লীব, পতিত, অথবা উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অথবা পতির মরণান্তে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।" দ্বাদশ প্রকার পুত্রের গণনায় বশিষ্ঠ ঋষি পৌনর্ভবকে চতুর্থ স্থান প্রদান করিয়াছেন। যথা—"পৌনর্ভব শ্চতুর্থ।

দ্বাপরের ধর্ম্মশাস্ত্রকার শঙ্খ ও লিখিত বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। দক্ষ-ঋষিও তাহাই করিয়াছেন। মহর্ষি শাতাতাপ স্বীয় সংহিতায় কেবল কতকগুলি প্রায়শ্চিত্তের কথা লিখিয়াছেন। মহর্ষি ব্যাসপ্রণীত সমুদ্র সদৃশ মহাভারত পরিত্যাগ করিয়া গোষ্পদ সদৃশ ক্ষুদ্র "ব্যাস সংহিতার" আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের বিংশতি খানা সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে আমরা ১৯ খানার কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া ঋষিগণ দ্বারা কথিত হইয়াছে। এক্ষণ দেখা উচিত, এ কলিকালের জন্য কোন সংহিতা লিখিত হইয়াছিল কি না?

"কৃতেতু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতম স্মৃতঃ। দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পরাশর স্মৃতঃ॥"

পরাশর সংহিতা ১।২৩।

কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষি পরাশর বিবাহ সম্বন্ধে অন্য কোন কথা না বলিয়া কেবল বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—"নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎস্বনারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

পরাশর সংহিতা। ৪।২৭।

স্বামী নিরুদ্দেশে, মরণান্তে, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে, ক্লীব স্থির কিম্বা পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদে রমণীর অন্য পতি গ্রহণ বিধিসঙ্গত।*

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* গত বারের ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত "বিধবা বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল, আমরা যখন রাজা রাজবল্লভের জীবনচরিত লিখি (বান্ধবে) তখন বলিয়াছিলাম যে, উক্ত রাজা তাহার বাল বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। সেই সময় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চক্রান্ত করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে দেন নাই। তৎপরেই আমরা মন্তব্য স্থলে বলিয়াছিলাম যে—"প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রেতপুরে গমন করিয়াছেন। এই কাল মধ্যে সমাজের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সময় শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণ মনোযোগ করিলেই হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও মতে যাঁহারা বিধবা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সমাজ-চ্যুত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। আমরা বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিতেছি, শিক্ষিত ভূম্যধিকারিগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করুন।"

জ্যোৎস্নাময়ী।*

জ্যোৎস্নাময়ি!
স্বর্গের জ্যোৎস্না তুই,—কিন্তু কোন্ পাপে
ভারতে রমণী জন্ম করিলি গ্রহণ?
আকাশের তারকাটী, কেন রে ছুঁইলি মাটী;
নিবিতে পবিত্র জ্যোতি বাকী কতক্ষণ?

ইহার কিছু কাল পরেই আমরা দেখিতে পাইলাম যে, নলডাঙ্গা-পতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায়বাহাদুর এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা দর্শনে আমাদের হৃদয়ে অপার আনন্দ সঞ্চার হইল। আমাদের হৃদয়ের সহিত রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। হৃদয়ের পবিত্র আসনে বসাইয়া প্রমথভূষণকে পূজা করিতে লাগিলাম।

এক্ষণে নড়ালের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার রায়ের আচরণে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হইতেছে, চন্দ্র কুমার বাবু রাজা বাহাদুরের পরিশ্রম ও যত্ন পণ্ড করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। তিনি কাশী নিবাসী পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধ-ব্যবস্থা আনাইয়াছেন। বোধ হয়, অনেকে জানেন যে, উকিলের "ওপিনয়ন" ও পণ্ডিতের ব্যবস্থা লওয়া কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজ অর্থ লোভে ত্রিপুরার জল-তরঙ্গে কিরূপ ঘোল ঢালাইয়াছেন, তাহা কে না জানে? সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোন মহাত্মা এই ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য অবশ্যই পণ্ডিতদিগকে কিঞ্চিৎ বিশেষ দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে।

নড়ালের জমীদারদিগের পূর্ব্ব পুরুষ কালীশঙ্কর রায় কিরূপে এই অতুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ লোকে না জানিতে পারেন। কিন্তু ইতিহাস-লেখকের হৃদয়ে তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ রহিয়াছে। কোথায় চন্দ্র কুমার বাবু সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া সেই কালীশঙ্করের কুকার্য্য ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া হিন্দু সমাজের প্রকৃত শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। চন্দ্র কুমার বাবু অর্থ ব্যয় করিয়া কাশী হইতে ব্যবস্থা আনাইয়াছেন।

চন্দ্র কুমার বাবু পণ্ডিতদিগকে লিখিয়াছিলেন যে, "কলিযুগে বিধবা বিবাহ, শাস্ত্র-সিদ্ধ কিনা, বিধবা বিবাহ-কর্ত্তা, তৎপ্রয়োজক, অনুমতি দাতা, ও মন্ত্রপাঠক পাপগ্রস্ত হয়েন কিনা, বারম্বার ঈদৃশ অনুষ্ঠান যাঁরা তাঁহারা পতিত হয়েন কিনা, ইহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ইহাদের যাজন ও অন্ন ভোজনে অন্যের পাপ স্পর্শ করে কিনা, প্রমাণ ও যুক্তিসহ এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দানে আমাকে কৃতার্থ করিবেন।"

তদুত্তরে পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন যে, "কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, বিধবা বিবাহ-কর্ত্তা, প্রয়োজক আদি সকলেই পাপভাগী ও বারম্বার অনুষ্ঠানে পতিত হইবেন এবং তাঁহাদের সংসর্গকারীগণও পাপযুক্ত হইবেন, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের অভিমত।

পণ্ডিতগণ যে সকল বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু পুরাণ অপেক্ষা ধর্ম্ম শাস্ত্র যে প্রবল, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে তাহাদের মত পোষণোপযোগী বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যে দুই একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসংলগ্ন ও অকর্ম্মণ্য। এই সকলের বিরুদ্ধে পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। চন্দ্রকুমার বাবু এই ব্যবস্থা পত্রের সহিত যদি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ পরস্পর তুলনা করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পণ্ডিতগণ পরা-

---

* কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের শিশু কন্যা।

ও বালিকা! ও সরলা! লাগিলে মাটীর মলা,
দেখেযো হৃদয়ে বসে কলঙ্ক ভীষণ!

ও জ্যোতিতে ও কিরণে, স্বর্গীয় হৃদয় মনে,
পবিত্র মাধুরীময় সরল অমন,—
ঘৃণা লজ্জা হিংসা দেষে, ছিন্নভিন্ন হয়ে শেষে,
বসিবে বাসনা-দাগ পাপ প্রলোভন;
স্বর্গের জ্যোৎস্না ছবি মলিন এমন!

১

এমন জ্যোৎস্না রাশি—এমন সরল,
এত স্বচ্ছ পরিষ্কার, কোথাও দেখি না আর,
এমন দর্পণ সম শুভ্র নিরমল!
হৃদয়ের গুপ্ত ঠাঁই, আপন হৃদয় নাই,
পর প্রতিবিম্বে উহা সতত উজ্বল!
এমন আপনা-ভোলা, এমন অন্তর খোলা!
নয়নে নন্দনবন হাসে অবিরল,
দেখিনে কোথাও আর, এত স্বচ্ছ পরিষ্কার,
এমন দর্পণ সম হৃদয় নির্ম্মল!
এত কাছে২ থাকি, এত কোলে কাঁকে রাখি,
তথাপি ভরেনা প্রাণ সতত পাগল!
যেন মাখনের দলা, মধুভরা গলা গলা,
ছুঁইতে উথুয়ে আহা উঠে পরিমল!

শর সংহিতার বচন গুলির নিতান্ত কূট অর্থ করিয়াছেন। কোন একটি বিতর্কিত বিষয়ের বিচার করিতে হইলে মূল শ্লোকের সরল অর্থ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের জটিল ও বিকৃত ব্যাখ্যা করা কখনই সঙ্গত কার্য্য নহে। এক সময়ে ভারতের এমনই দুর্দ্দিন ছিল, যখন সাধারণ মানবগণ ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করা দূরে থাকুক, দর্শন করিতেও পাইত না। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় এইক্ষণ সেই অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণ অধিকাংশ বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে বৈদিক সময়ের "সূক্ত" গ্রন্থ ও পরবর্ত্তী কালের বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরাজ করিতেছে। এখনও কি আমাদিগকে অজ্ঞের ন্যায় সে কালের মত কেবল পণ্ডিতদিগকে বলিতে হইবে, "মহাশয় এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রে কি লিখিত আছে, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিন।" আমরা কি অন্ধ, আমরা কি ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিতে জানি না যে, এক জন পণ্ডিত দর্পকে ভেক বলিলে তাহাই স্থির করিয়া রাখিব? তাই চন্দ্রকুমার বাবুকে বলিতেছি, তিনি কূট বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল ভাবে ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখুন, তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া কাশী হইতে যে ব্যবস্থা পত্র আনাইয়াছেন, তাহা কখনই প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রের সম্পূর্ণ পোষকোপযোগী নহে।

আর একটী কথা স্বীকার করা যাউক যে, দুই এক জন শাস্ত্রকার বিধবা বিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ৪ সহস্র কিম্বা ২ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে সেই শাস্ত্র কখনই স্থির থাকিতে পারে না। এক সময়ে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের দাসত্ব করা দূরে থাকুক, জল গ্রহণও করিতে পারিতেন না; করিলে তাঁহারা পতিত হইতেন। এক্ষণ যে ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছে, কে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করিতেছেন? চন্দ্রকুমার বাবুর বাটীতে কি ব্রাহ্মণ চাকর নাই? তাঁহাদিগকে কি সমাজ-চ্যুত হইতে হইয়াছে? ইহা আমরা চন্দ্রকুমার বাবুর নিকট জানিতে ইচ্ছা করি। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন হইবে। সেই সঙ্গে ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবেন? তোমার আমার কিঞ্চিৎ সুবিধার জন্য আমরা ধর্ম্ম শাস্ত্রের শিরে অকুত্ত হৃদয়ে পদাঘাত করিতে পারি, কিন্তু দুর্ব্বলা অবলাদিগকে নির্যাতন করিবার সময়ে "ধর্ম্ম শাস্ত্র, ধর্ম্ম শাস্ত্র" বলিয়া চীৎকার করা কি কাপুরুষের কর্ম্ম নহে! আমরা বিধবাদিগকে জোর করিয়া বিবাহ দিতে বলিতেছি না, কিন্তু যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণ করিবেন, ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভাণ করিয়া তাঁহাকে নির্যাতন করিতে তোমার আমার কি অধিকার আছে? ৬০ বৎসরের সময় পত্নী বিয়োগ হইলে তুমি আমি (বৈতরণী পার হওয়ার জন্য) পুনর্ব্বার একটী ৯।১০ বৎসরের বালিকা বিবাহ করিব; আর ৯।১০ বৎসরের একটী বালিকা, যে ইহ জীবনে স্বামী কি তাহা জানিতে পারিল না, তাহাকে জোর করিয়া চিরকাল বিধবা রাখিতে হইবে, ইহা কি কাপুরুষের কার্য্য নহে?

২

কোন্ চন্দ্রমার তুই জোছনা এমন?
যে করে ধরণী আলো, সেত রে কলঙ্কে কালো,
সেত অতি অপবিত্র রাহুর বমন,
কোথা তার এ সুহাসি, স্বর্গীয় এ ভাব রাশি,
তাহার লাবণ্যে এত নাহি ভোলে মন!
অবনীর কুবলয়, শিশিরে মলিন হয়,
শারদ সুষমা আর থাকে না তখন,
কিসে হবে পঙ্কজাত, পঙ্কেতে মধু এত?
সামন্ত শতদ ও'তে করে গুঞ্জরণ!
কোন্ ত্রিদিবের শশী হইতে পড়িলি খসি,
সুন্দর সরল স্নিগ্ধ জোছনা এমন?
কোথারে মানস-সরে, সে কমল শোভাকরে,
যাহার সুষমা তুই সুরভি কাঞ্চন?

জ্যোৎস্নাময়ি!
স্বর্গের জ্যোৎস্না তুই,—কিন্তু কোন্ পাপে,
ভারতে রমণী জন্ম করিলি গ্রহণ?
পুরুষেরা অত্যাচারে, এদেশে রমণী মারে,
এদেশে কঠিন বড় পুরুষের মন!
এদেশের বাপ ভাই, দয়া নাই মায়া নাই,
অকরুণ ব্যাধ বধে কুরঙ্গী যেমন!
গঙ্গা যমুনার মত, রমণী জীবন কত,
দুঃখের সাগরে সদা করে আলিঙ্গন!
পাষাণের বাপ ভাই, দেখিয়া না দেখে তাই,
অচল অটল রহে হিমাদ্রি যেমন!
আহা হা স্বর্গের মেয়ে, তোর পানে চেয়ে২,
প্রতিদিন ভাবি তোর কপাল কেমন!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

নভেলের শিল্প বা কবিত্ব।

আমরা পূর্ব্বে উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রের কথা বলিয়াছি, কিন্তু চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথার বিশেষ উল্লেখ করি নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, চরিত্র অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে। বলিতে কি, যেমন প্রত্যেকের মুখাবয়ব ও আকৃতি বিভিন্ন, তদ্রূপ প্রত্যেকের চরিত্র বা প্রকৃতিও বিভিন্ন। চরিত্র যে এত বিভিন্ন হয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে, চরিত্র-সংগঠনী শক্তিগুলি নানা প্রকার। মনে কর, যদি চরিত্র-সংগঠনী শক্তি সংখ্যা বিংশতি হয়,—আর তন্মধ্যে দশটী মাত্র শক্তি দ্বারা প্রত্যেক চরিত্র সংগঠিত হয়, তাহা হইলে বীজগণিতের সংমিশ্রণী (Combination) নিয়মানুসারে প্রায় বিংশতি লক্ষ বিভিন্ন চরিত্র সংগঠিত হইতে পারে। তবে যদি চরিত্র-সংগঠনী শক্তি সংখ্যা আরও অধিক হয়, (এবং তাহাদেরও ন্যূনাধিক পরিমাণ থাকে, বিবেচনা করা যায়) তবে অসংখ্য বিভিন্ন চরিত্র সংগঠিত হইবার কারণ আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। সে যাহা হউক, আমারা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এই সমস্ত চরিত্র-সংগঠনী শক্তি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। এক বাহ্যিক বা আধিভৌতিক শক্তি, আর এক আন্তরিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি। এই আধ্যাত্মিক শক্তিই চরিত্র স্ফূর্ত্তি করে, আধিভৌতিক শক্তি সেই স্ফূর্ত্তির সাহায্য করে মাত্র। অতএব চরিত্রের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিমাণ অনুসারে, আমরা চরিত্রের সমষ্টি শক্তির পরিমাণ করিতে পারি।

উল্লিখিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে আমরা প্রধানত তিন ভাগে বিভাগ করিতে পারা যায়। মনোবিজ্ঞান বলে যে, আমাদের মন তিন প্রকার বৃত্তির সমষ্টি মাত্র। প্রথমত,

বৃত্তি ও চিন্তা বৃত্তি, ইংরাজীতে ইহাকে Intellect বলে। ইহার সহিত আমরা কল্পনা বৃত্তিকে(Imagination)এক শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। দ্বিতীয়ত,আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, (Feeling) ইহাকেই প্রকৃত চিত্ত-বৃত্তি বলা উচিত। তৃতীয়ত, ইচ্ছা-বৃত্তি বা বাসনা (Willing) ইহার দ্বারাই আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। প্রথম গুলি আমাদের জ্ঞান ও চিন্তা বৃত্তি,দ্বিতীয় গুলি আমাদের চিত্তবৃত্তি, আর শেষ গুলি কার্য্য-কারিণী বৃত্তি। যাহার এই বৃত্তিগুলির পূর্ণ মাত্রায় স্ফূর্ত্তি হয়, সেই সর্ব্ব প্রধান চরিত্র। চিত্ত-বৃত্তি গুলিকেও আবার সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,কতকগুলি আমাদের আত্মপর (selfish বা egotistic) বৃত্তি। ইহাতেই আমাদিগকে স্বার্থপর করে—সংসারকে তাচ্ছল্য করিয়া, অন্য লোকের ক্লেশ বা দুঃখ অবহেলা করিয়া, আমরা এই বৃত্তি বলেই স্বকার্য্য সাধনের জন্য যত্ন করি। অন্য গুলি অনাত্মপর বৃত্তি ; ইহা দ্বারাই আমরা পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করি এবং পরহিত ব্রতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করি।

অতএব যে চরিত্রের জ্ঞান-বৃত্তি ও কার্য্য-কারিণী বৃত্তির চরম উন্নতির সহিত অনাত্মপর বৃত্তি গুলির, বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই আমাদের আদর্শ (Ideal) চরিত্র। কিন্তু যাহাদের অনাত্মপর বৃত্তির পরিবর্ত্তে আত্মপর বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তাঁহারা প্রধান চরিত্র হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা সংসারে অধম ও অত্যন্ত ভয়ানক চরিত্র। সাধারণ চরিত্র এই দুই সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে—কখন অতিক্রম করিতে পারে না। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, চিত্তবৃত্তিই আমাদের কার্য্য কারিণী বৃত্তির উত্তেজক। সুতরাং এই চিত্ত-বৃত্তি যত প্রবল হয়,—সেই পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা-বৃত্তি গুলির কার্য্য স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। চিত্ত বৃত্তি আত্মপর হইলে, সে চরিত্রের কার্য্যও অত্যন্ত অসৎ ও সমাজের অমঙ্গলকর হইবে।

সে যাহা হউক, মহাপুরুষদের বা আদর্শ চরিত্রের মহত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে, যেমন, সমাজের ও জগতের উন্নতি কল্পে তাঁহারা যে পরিমাণে, শক্তির স্ফূর্ত্তি করিয়াছিলেন, তাহার পর্য্যালোচনা করি—যে পরিমাণে সংসারের উন্নতির জন্য কার্য্য করিয়াছেন, তাহার শক্তি (Momentum) পরিমাণ করি ; চরিত্র উপলব্ধি করিতে আমরা সেরূপ শুধু কার্য্যের পরিমাণ না করিয়া, তাহার সমুদায় বৃত্তিরই শক্তি স্থির করিয়া থাকি। অতএব নভেল-লেখকের চরিত্র চিত্র সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি ? তিনি চরিত্র-সংগঠনী শক্তি গুলি যতদূর পারেন, বুঝাইয়া দিবেন। সংগঠিত চরিত্রের শক্তি, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির পরিমাণ, তাহার আত্মপর ও অনাত্মপর চিত্ত-বৃত্তির পরিণাম, এবং কার্য্য-কারিণী শক্তি গুলির পরিণাম বুঝাইয়া দিবেন। কি করিয়া বৃত্তি গুলির এরূপ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা যতদূর পারেন, দেখাইয়া দিবেন। তাহার পর তিনি এরূপ চরিত্রের কার্য্য প্রণালী বুঝাইয়া দিবেন। অতএব নভেল-লেখকের প্রধান কর্ত্তব্য, মনোবিজ্ঞান সহজে পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া,—মনোবৃত্তি গুলির গতি, শক্তি ও ক্রিয়া দেখাইয়া দেওয়া। কোন্ বৃত্তি ভাল, কোন্ বৃত্তি মন্দ, কোন্ কার্য্য সৎ, কোন্ কার্য্য অসৎ—কোন্ চরিত্র উত্তম, কোন্ চরিত্র অধম, তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার

ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। তাঁহার নীতি শাস্ত্র বুঝাইবার তত প্রয়োজন নাই, —মনোবিজ্ঞান বুঝানই প্রধান কর্ত্তব্য। পণ্ডিত টেন সাহেব বলিয়াছেন,—

"What is a novelist? In my opinion he is a psychologist who naturally and involuntarily sets psychology at work; he is nothing else, nor more. He loves to picture feelings, to perceive their connections, their precedents, their consequences: and he indulges in this pleasure. In his eyes they are forces, having various directions and magnitudes. About their justice or injustice he troubles himself little." History of English Literature, vol. II. p. 390.

সুতরাং নভেল-লেখকের কাজ বড় সহজ নহে। এই চরিত্র-চিত্রেই তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প-নৈপুণ্য বা প্রকৃত কবিত্ব কি? যেমন চিত্রকর প্রকৃত ঘটনা অনুকরণ করিয়া তাহার প্রতিচিত্র অঙ্কিত করেন,—যেমন ভাস্কর একখণ্ড শিলা খোদিত করিয়া তাহাকে জীবিত-কল্প মনুষ্যে পরিণত করিতে পারেন, সেইরূপ সাহিত্য-জগতে যথার্থ শিল্পকর যিনি, তিনি স্বভাব অনুকরণ করিয়া চরিত্রের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। এই স্বভাবের অনুকরণই শিল্পের প্রাণ। যেখানে একটু মাত্র অস্বাভাবিক হইল, সেই খানেই শিল্প-কৌশল সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। চিত্রকরের কাজ সহজ, কেন না তিনি কোন বিশেষ অবস্থার, বিশেষ সময়ের বা বিশেষ ঘটনার চিত্র মাত্র অঙ্কিত করেন। তাঁহার চিত্রে যাহা অঙ্কিত থাকে, তাহা অতি পরিষ্কার রূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় সত্য, কিন্তু সে চিত্র দেশ কাল বা পাত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রকৃত কবি শিল্পীর কাজ বড়ই গুরুতর। তিনি কোন বিশেষ অবস্থা, বিশেষ ঘটনা বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের কার্য্য অঙ্কিত করেন না, দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ নহে, তাঁহাকে এরূপ অনেক ঘটনা চিত্র করিতে হয়,—তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইতে হয়, —তাহাদের ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি শিল্পী যিনি, তিনি সর্ব্বকালিক, সর্ব্বদেশীয় এবং সর্ব্বজনীন এক নূতন সংসার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৃষ্ট এই নূতন জগৎ,প্রকৃত সংসারের সম্পূর্ণ অনুকরণে হওয়া আবশ্যক। সৎ অসৎ,ভাল মন্দ,সুনীতি দুর্নীতি তিনি কিছুই দেখিবেন না, সংসারে যাহা পাইবেন,তাহাই চিত্র করিবেন। চিত্রের ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা করিতে পাইবেন না। শুধু তাহাই নহে, তিনি বাহ্য-জগতের শুধু উপরিভাগ—শুধু আবরণ দেখিয়া তাহাই চিত্র করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। জগতের মূলকারণ মধ্যে—তাহার মূল সত্য মধ্যে—অন্তর্জগতের গূঢ়তম স্থানে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। সাধারণে যাহা দেখিতে পায় না—যাহা দৈবশক্তি বলে কেবল কবির জ্ঞান-চক্ষে প্রকাশ পায়, —তাহা সাধারণকে দেখাইতে হইবে— তাহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝাইতে হইবে। যাহা লোকে দেখিয়াও দেখে না—বুঝিয়াও বুঝে না—তাহাই প্রকৃত কবিকে দেখাইতে হইবে। মুহূর্ত্তের বাহ্যিক ভঙ্গিতে আমাদের মনের যে গূঢ়তম লুক্কায়িত ভাব সকল প্রকাশ পায়, তাহা চিত্রকর কেমন সুন্দর রূপে আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। স্বভাবের রত্ন ভাণ্ডারের মধ্যে চারিদিকে কত অপূর্ব্ব শোভা বিরাজিত রহিয়াছে—সংসারের কঠোর তাড়নায় আমরা তাহা দেখিতে পাই না, বুঝি সে শোভা দেখিবার বৃত্তি

গুলিই আমাদের শুকাইয়া গিয়াছে। শিল্পী যিনি, তিনি তাহা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দেন। অতএব শিল্পী যিনি, তাঁহার কাজ বড়ই কঠিন। তিনি সাধারণের শিক্ষক, সাধারণের নেতা। তিনি সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেন—তাহার গূঢ় ব্যাপার সকল স্বয়ং বুঝিতে পারেন—চরিত্রের কার্য্য, তাহার মনের ভাব, তাহার চিন্তার গতি, জগৎ ও অন্যান্য চরিত্রের সহিত সংশ্রবে তাহার মনের ঘাত প্রতিঘাত,—সেরূপ চরিত্র সংগঠনী শক্তি গুলি সমস্তই শিল্পী দেখিতে পান। দেখিয়া, সে সকল সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কারলাইল এক স্থানে বলিয়াছেন, শিল্প ও সত্যে প্রভেদ নাই। যেখানে সত্যের অপলাপ, সেই খানেই শিল্পের হানি! সত্যই শিল্পের প্রাণ। তবে সত্য কি সকলে বুঝিতে পারে?—তাহা হইলেত পৃথিবী স্বর্গ হইত। যতই জগতের উন্নতি হইতেছে, ততই সত্যগুলি ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে—ততই লোকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে। যাহা থাকিবে তাহাই সত্য, যাহাতে জগৎকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে, মানুষকে নিজ উদ্দেশ্য পথ দেখাইয়া দিবে, তাহাই সত্য। যাহা সৎ, অথবা যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই সত্য! নতুবা ত আর সবই অসৎ। এই সত্যগুলি জগতে যাহারা প্রচার করেন, যাহারা এই সত্য প্রথমে দেখিতে পান—এবং দেখিয়া তাহা জগৎকে দেখাইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত কবি, প্রকৃত শিল্পী। ইংরাজীতে একটী হিব্রু কথা আছে—প্রফেট (Prophet), প্রফেট বলিলে এখন আমরা ভবিষ্যৎ বক্তা বুঝি, যে অনুগৃহীত ব্যক্তি ঈশ্বরের সত্য সংসারে প্রচার করেন, আমরা তাঁহাকেই প্রফেট বলিয়া থাকি। এই প্রফেট, আর পোয়েট একই কথা। কবি যিনি—তিনিইত অনুগৃহীত ব্যক্তি—তিনিই ত সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের সত্য দেখিতে পান,—আর সে সত্য পাইয়া জগতে তাহা প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং তিনিইত প্রকৃত ভবিষ্যৎবক্তা—সত্য প্রচারক। অতএব কবি শিল্পীর কাজ বড়ই গুরুতর। তিনি সকলের আগে যে সত্য দেখিতে পাইলেন, তাহাই প্রচার করা তাঁহার কার্য্য, এই প্রচারেই তাঁহার শিল্পকৌশল নির্ভর করে। সত্য যেন এরূপ ভাবে প্রচারিত না হয় যে, তাহাতে সত্যের রূপান্তর হয়। সে সত্য পরিষ্কার করিয়া সাধারণে বুঝাইতে হইবে—যেন কোন কথা অতিরঞ্জিত না হয়, কোন কথা অপ্রকাশিত না থাকে। তাহা হইলেই সত্যের অপলাপ হইল। কবির শিল্প-চাতুর্য্য সকলই বিফল হইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ত, এই সত্য প্রচার করিতে গিয়া, কবিকে সৎ অসৎ, ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ কিছুই দেখিতে হইবে না, তাঁহাকে সে সব কিছুই ভাবিতে হইবে না। যে সত্য তিনি বুঝিবেন, তাহাই জগতে প্রচার করিবেন, সৎ অসৎ, ভাল মন্দ বাছিয়া লইবার ভার জগৎকে দিবেন। এই সংসারইত সৎ অসৎ, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সুনীতি কুনীতি প্রভৃতি দ্বৈত ভাবে জড়িত, এই রূপ দ্বন্দ্ব দ্বারাই গঠিত। তোমার কাছে ন্যায় অন্যায়, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু সংসারে সেরূপ নহে। সংসারের কাছে সবই ভাল, কেন না সবই ত সংসারের কার্য্য। এই

দুই রূপ পদার্থে মিলিয়াইত সংসার গঠিত। কবি যিনি, তিনিও ত সংসারকে অনুকরণ করেন, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সত্য গুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লন। সে সত্য মধ্যে ভাল মন্দ থাকিতে পারে, সৎ অসৎ থাকিতে পারে, তাহাতে কবির কি?—তিনি ত সমান-রূপে অপক্ষপাতের সহিত উভয় হইতেই সত্য দেখাইবেন। জগতের কাজ, ভাল মন্দ বাছিয়া লইবে। আর এক কথা, মন্দ না দেখিলে ভালর মর্ম্ম কে বুঝে বল দেখি? কবি যদি মন্দ ছাড়িয়া শুধু ভালই দেখান, তবে মন্দ দেখাইবে কে?—তবে ভালর আদর বুঝাইয়া দিবে কে?—যিনি সত্য-পথের পথিক, যিনি জগৎরূপ সমুদ্রে ডুবিয়া প্রকৃততত্ত্ব-রূপ সত্যরত্ন উত্তোলনে ব্যস্ত, ভাল মন্দ বুঝিতে গেলে তাঁহার সত্য পথ অনুসরণ করা হয় কই? সেই জন্য কবি শিল্পীর ভাল মন্দ দেখা আবশ্যক নাই, সত্যই দেখিবেন, সত্যই দেখাইবেন। পণ্ডিত টেন্ এক স্থানে বলিয়াছেন;—

"A genuine painter sees with pleasure, a well-drawn arm, and vigorous muscles, even if they be employed in slaying a man. A genuine novelist enjoys the contemplation of the greatness of a harmful sentiment or the organised mechanism of a pernicious character. * * * * He represents them (faculties) to us as they are whole not blaming, not punishing, not mutilating; he transfers them to us intact and separate and leaves to us the right and of judging if we desire it." History of English Literature p. 390.

অতএব সত্যের উপরই শিল্প নির্ভর করে। প্রকৃত শিল্পী যিনি, তিনি সত্য ব্যতীত আর কিছু চিত্র করিতে চেষ্টা করেন না। কবিবর গেটে এ কথা এক স্থানে অতি সুন্দর রূপে বলিয়াছেন, তাঁহার মতে,

"In Arts' wide kingdoms ranges,
One sole meaning, still the same:
This is *Truth* eternal Reason,
Which from Beauty takes its dress."

কারলাইল বলেন,—কবি "is a new Instructor and Preacher of Truth to all men."

সে যাহা হউক, শিল্পের কথা আরম্ভ করিয়া আমরা অনেক দূর আসিয়াছি। কিন্তু কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে, এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান কবি সিলর কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক। ইঁহারও মতে, শিল্পীর কর্ত্তব্য জগতে সত্য প্রচার করা। শিল্পীই প্রকৃত পক্ষে জগতের শিক্ষক। কেন না প্রকৃত সত্য যাহা, তাহা তিনিই প্রথমে দেখিতে পান। তিনি বলিয়াছেন, কবির চিদাকাশের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে সৌন্দর্য্য-প্রস্রবণ বহির্গত হয়, তাহা চিরকাল স্বচ্ছ নির্ম্মল ভাবেই প্রবাহিত হইবে, ইহাই জগতের মালিন্য অপনীত করিবে, সংসারকে উন্নতির পথে চালিত করিবে।* বাস্তবিক শিল্পীরা জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার বাহ্যিক অসৎ, পরিবর্ত্তনশীল, এবং ধ্বংশ-প্রবণ অবয়ব মধ্যে যে এক অনন্ত, নিত্য সত্তার উপলব্ধি করেন—যে সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে বিভোর হইয়া যান, শিল্প বা কবিত্ব সেই যোগাবস্থা, সেই উৎকট সাধনাবস্থায় প্রসূত। সংসারের এই বাহ্যিক জড় প্রকৃতি মধ্যে—মনুষ্যের

* "From the pure æther of his spiritual essense flows down the Fountain of Beauty uncontaminated by the pollutions of ages and generations &c." "Schiller's Æsthetic Education of men."

উপরের কঠিন আবরণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে,যে জীবন,যে আত্মা,যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহা মহাপুরুষেরা দেখিতে পান—তাহা কবি শিল্পীও উপলব্ধি করেন। শুধু উপলব্ধি নহে—শিল্পী তাহা আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত, স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিয়া, তাহা জগৎকে দেখাইয়া দেন, এই খানেই তাঁহার কবিত্ব, এই খানেই তাঁহার শিল্প।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মন দার্শনিক ফিক্তে (Fichte) শিল্প সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—" There is a Divine Idea pervading the visible Universe; which visible universe is indeed but its symbol and sensible manifestation, having in itself no meaning, or even true existence independent of it. To the mass of men this divine Idea of the world lies hidden. * * Literary men are the appointed interpreters of this divine Idea; a perpetual priesthood, we might say, standing forth, generation after generation, as dispensers and living types of God's everlasting wisdom—to shut it in their writings and actions. . . . . . He may lay hold of the whole Divine Idea, in so far as it can be comprehended by man, or perhaps a special portion of this its comprehensible part." Carlyle's essays vol. I. P. 49

এমারসন এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—" So, in art that aims at beauty, must the parts be subordinated to Ideal Nature and everything individual abstracted, so that it shall be the production of the universal soul."

অতএব কবি যে পরিমাণে এই মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন, সেই পরিমাণেই তিনি প্রকৃত কবি। পণ্ডিত এমারসন বলিয়াছেন, "The universal soul is the alone Creator of the useful and the beautiful, therefore to make anything useful or beautiful, the individual must be submitted to the universal mind."

আরও বলি—এ সংসারের উন্নতি কিরূপ সাধিত হয়? জগৎ যে অনন্তগতিতে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার গূঢ় অর্থ কি? জড়জগতে শক্তি কোথায় যে, তাহা হইতে কার্য্য হইবে, তাহা হইতে গতি হইবে—বা তাহা হইতে স্বতঃই জগতের উন্নতি হইবে? এই জড়ের মধ্যে যে আত্মা আছে—তাহা হইতে যেমন জগতের পরিণতি, প্রকর্ষ পর্য্যন্ত, আদর্শ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াই,সেইরূপ সংসারের উন্নতি। এই আদর্শ-কল্পনা পথ-প্রদর্শক হইয়া, অনন্ত জগতের জ্যোতি হইতে ঈষৎ মাত্র প্রতিফলিত ক্ষীণালোক দেখাইতে দেখাইতে, অগ্রসর হইতে থাকে—সংসার সেই কল্পনা-রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে—তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে করিতে, অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাতেই ত আমাদের উন্নতি। অনন্ত আত্মা হইতে যেমন জড়জগৎ, শক্তি হইতে যেমন গতি, তেমনি আদর্শ কল্পনা হইতে উন্নতি। এই কল্পনা ও জড়ে যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া, (rhythm) এই কল্পনা হইতে যে কার্য্যের প্রসব, তাহাই সংসারকে ত তাহার উন্নতির পথে লইয়া যায়। মহাপুরুষেরা ও প্রকৃত কবিরাই এই কল্পনা-রাজ্যের অধিকারী। তাঁহারা এই কল্পনাকে—a local habitation and a name"—দিয়া,—তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা দেখাইয়া দেন,—পরবর্ত্তী লোকে তাহাকে যতদূর পারে, কার্য্যে পরিণত করে।

সে যাহা হউক, শিল্পীর এই আদর্শ কল্পনা, এক মহান্ সত্তা। ইহা এক ক্ষুদ্র জগৎ—ইহা এক প্রকাণ্ড (organisation) জৈবনিক। যিনি ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া, ইহার অংশ মাত্র দেখিতে পান, বা অংশ করিয়া দেখিতে চান, তিনি, ইহার মধ্যে যে জীবন, যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা দেখিতে পান না—তাহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি অস্থি বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হইতে পারেন—বড় জোর, মৃতপশুশালার (museum) বৃত্তান্ত বুঝিতে পারেন—কিন্তু জীব-জগতের কিছুই বুঝিবেন না। সেইরূপ, শিল্পীর শিল্পকে যিনি এইরূপ এক মহা রাজ্য বলিয়া না বুঝেন—যিনি তাহার এখানের অলঙ্কার, সেখানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ক্ষান্ত থাকেন,—তিনি কবিত্ব বুঝেন না—শিল্প-রাজ্যে প্রবেশের প্রকৃত অধিকারী হয়েন নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, কবি শিল্পীর মহান্ চিত্র মধ্যে বড় অধিক লোক প্রবেশ করিতে পারে না। সেক্ষপীয়রের অনন্ত সৃষ্ট রাজ্যের মহত্ব সে দিন মাত্র জর্ম্মাণ পণ্ডিতেরা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালিদাসের আশ্চর্য্য কবিত্ব,—তাঁহার উচ্চতম শিল্প-চাতুর্য্য প্রথমে গেটে বুঝিয়াছিলেন—আমাদের দেশশুদ্ধ পণ্ডিত বড় জোর বুঝিতেন " উপমা কালিদাসস্য।" তাই বলি, কবির সৃষ্ট রাজ্যে প্রবেশ করা বড় সহজ নহে। সেই জন্য কারলাইল বলিয়াছেন,——"To take in the fair relations of the whole, to see the building as one object, to estimate its purpose, the adjustment of its parts and their harmonious co-operation towards that purpose, will require the eye and the mind of a Vitruvious or a Palladio."

Essays, Vol. I p. 219.

এই খানেই আমরা প্রকৃত সমালোচকের কার্য্য জলন্তভাবে দেখিতে পাই। প্রকৃত সমালোচক যিনি, তিনি কবির সৃষ্ট রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিবেন—তাহার সৌন্দর্য্য দেখিবেন,—দেখিয়া তাহা সাধারণকে দেখাইতে চেষ্টা করিবেন। সকলে কিন্তু কবির সৃষ্ট জগৎ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারা উপরিভাগ দেখে মাত্র—বাহ্যিক কঠিন আবরণ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে মাত্র। সমালোচকই তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া—তাহার সৌন্দর্য্য,—তাহার মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্য,—তাহার চমৎকার (organisation) সৃষ্টি-কৌশল,—সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। কারলাইল বলিয়াছেন,—"Criticism stands like an interpreter between the inspired and the un-inspired." অতএব সমালোচকের কার্য্যও বড় সহজ নহে। যিনি শুধু শব্দের মাধুর্য্য, উপমার সৌন্দর্য্য বা ভাবের গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া ক্ষান্ত হন, তিনি প্রকৃত সমালোচক নহেন—তিনি কাব্যের উপরের আবরণ—তাহার বাহ্য 'পোষাক' (garment) দেখেন মাত্র। যিনি কাব্য মধ্যে কবির মন বুঝিতে চান, প্রকৃত কবি শিল্পীর সৃষ্টিতে তিনি তাহা দেখিতে পাইবেন না। কারণ,

—"* * As hard to discover in his writings what sort of spiritual construction he has, what are his temper, his affections. For all lives freely within him. All characters are alike indifferent or alike dear to him, he is of no sect or caste, he seems neither this man, nor that man, but a man " Carlyle on Goethe p. 212.

কারণ, বলিয়াছিত, প্রকৃত কবিশিল্পীর সৃষ্টি সর্ব্বকালীন, সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বজনীন। যাঁহারা এরূপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা শিল্পের বাহ্য আবরণ (body) দেখেন। অত-

এব প্রকৃত সমালোচককে কবির সৃষ্টির অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত কবি নহেন—যাঁহারা প্রকৃত শিল্পী নহেন—সমালোচকেরা তাঁহাদের সমালোচনা করিবেন না। অথবা যে সকল শিল্পী শুধু জীবিকার জন্য তাঁহাদের শক্তির অপব্যবহার করেন(ইংরাজীতে যাহাদিগকে Bread-artist বলে) তাঁহাদের বিকৃত শিল্পও সমালোচকের দেখিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা এরূপ শক্তির অপব্যবহার করেন—সমালোচক তাঁহাদের জন্য তাঁহার লেখনী কলুষিত করিবেন না। কারলাইল্ বলেন,—তাঁহারা "lie without the limits of criticism, being subject not for the Judge of art but for the Judge of POLICE."

সে যাহা হউক, আমরা এস্থলে শিল্প সম্বন্ধে যে এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, শিল্পই নভেলের প্রাণ। যে নভেলের শিল্প নাই, তাহার আর সব গুণ থাকিলেও তাহা নভেল নহে। লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ভাস্কর যদি উৎকৃষ্ট জীবিত-কল্প মনুষ্য শোধিত করেন—এবং তাহাকে মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করেন—তাহা যতই কেন জীবিত মনুষ্যের মত বোধ হউক না কেন—তাহা কখনই মনুষ্য নহে। তাহাতে প্রাণ নাই। তাহার সহিত প্রস্তরের যত দূর সম্বন্ধ আছে জীবিত মনুষ্যের সহিত তাহার কিছু সম্বন্ধই নাই। অতএব নভেলের আর সমস্ত গুণ থাকিলেও যদি তাহাতে শিল্প না থাকে—যদি সে কবি সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ না থাকে—যদি তাহা জীবনীযুক্ত structure না হয়—তবে তাহাকে নভেল বলা যায় না।

সংসারে যেমন জড় ও জীবন, দুই দেখিতে পাই, কবি সৃষ্টিতেও সেইরূপ বাহ্য জগতের চিত্র—মনুষ্য চরিত্রের চিত্র, দুইই থাকিবে। নভেলের এই দুইটীই অঙ্গ। তবে কেহ জীবন ও সংসার উভয়কেই এক অনন্ত আত্মার মধ্য দিয়া দেখেন, কেহ বা বাহ্য জগতে চরিত্রকে ডুবাইয়া দেন—যেন তাহার সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যেন বাহ্য-জগৎ হইতে তাহার অন্য অস্তিত্ব নাই। আবার অনেকে চরিত্রগুলিকে অনন্ত আত্মার ছায়ায় অঙ্কিত করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত বাহ্য জগৎ ডুবাইয়া রাখেন। শুধু স্বভাব বর্ণনা, সাধারণ কবির কাজ। শুধু চরিত্র বর্ণনা, নাটক লেখকের কাজ। কিন্তু যিনি প্রকৃত শিল্পী, তিনি, কাব্যেই হউক আর নাটকেই হউক, বাহ্য ও অন্তর্জগতের যে মাখামাখি, মিশামিশি ভাব—উভয়ের সম্মিলনে যে অদ্ভুত সৃষ্টি, তাহারই গূঢ় রহস্য দেখাইয়া দেন। নাটক অপেক্ষা নভেলে শিল্পীর কার্য্যক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত। ইহাতে যেমন বাহ্য ও অন্তর্জগৎ, স্বভাব ও চরিত্রে পরস্পরের সম্বন্ধ, ঘাত প্রতিঘাত, মিশামিশি দেখান যায়, নাটকে তত সুবিধা নাই—কারণ নাটকে বাহ্যজগৎ প্রবেশ করাইতে গেটের মত শিল্পীর কৌশল আবশ্যক,—সেক্ষপীয়রের মত কবিত্বের প্রয়োজন। নতুবা এক খানি "ফষ্ট" বা একখানি "হাম্লেট্" রচিত হইত না। অনন্তের জীবন্ত ভাব—অনন্তের অজ্ঞাত ভাব—অনন্তের মহান ভাবে, বাহ্য ও অন্তর্জগতের সম্মিলনে,—ফষ্টের সৃষ্টি। অন্তরের কাছে ইহাদের ক্ষুদ্রত্ব দেখাইতে গিয়াই বুঝি হামলেটের সৃষ্টি। আর মধুরিমা ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডারে বাহ্য ও অন্তর্জগৎকে ডুবাইয়া বুঝি কালিদাসের শকুন্তলার সৃষ্টি। কিন্তু কি বলিতেছিলাম ?—

আজ কাল নভেলই কবির শিল্প চাতুর্য্য দেখাইবার প্রধান অবলম্বন। এখন কাব্য নাটকের সময় গিয়াছে। কঠোর বিজ্ঞানের সময় আসিয়া—(age of analysis) আসিয়া কল্পনার রাজ্য তাড়াইয়া দিতে বসিয়াছে,—জগৎকে, মনুষ্যকে এখন জড়ভাবাকৃষ্ট (material) করিয়া তুলিতেছে। এই কল্পনা ও জড়ের কতকটা সংমিশ্রণে, এই জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের সংযোগে কবি-শিল্পীর নভেল সৃষ্টি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, তৃতীয় শ্রেণীর চরিত্র-চিত্রে ইহার পূর্ণ প্রচার। সে যাহা হউক, শিল্পই নভেলের প্রাণ। শিল্প-কৌশল না থাকিলে নভেলের নভেলত্ব কোথায়? কারলাইল বলিয়াছেন, "Novels . . . are entities. They must leave on us the impression of a perfect, homogeneous, indivisible whole. * * * (Being a) true work of art, it requires to be *fused* in the mind of its creator, and as it were poured forth from his imagination at one simultaneous gush." Carlyle on T. Richter p. 18.

অতএব নভেল লেখা বড় সহজ নহে। এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সেই জন্য বোধ হয়, প্রকৃত কবি শিল্পীর সৃষ্টি হয় নাই। শিল্পাংশে বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ ব্যতীত আর এক খানি নভেলও বাঙ্গালায় নাই। নাটক ও কাব্যে ত শিল্পের কথাই নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে আজিও প্রকৃত কবি-শিল্পী জন্মায় নাই, নতুবা বাঙ্গালীর এত দুর্দ্দশা কেন? এক জন সেক্ষপীয়র, কি কালিদাস, কি গেটে জন্মিলে এক জাতির কত গর্ব্ব হয়;—সংসারের সে জাতি কত বড় হয়, যিনি বুঝিতে পারেন, তিনিই বুঝিবেন, বাঙ্গালায় কেন একজন প্রকৃত শিল্পী জন্মায় নাই। বঙ্কিম বাবুর নভেল গুলির মধ্যে প্রথমকার দুই এক খানিতে অনেকটা শিল্প-চাতুর্য্য আছে,—তাই বঙ্কিম বাবুর নভেল বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ নভেল;—শুধু নভেল নহে, কি নাটক, কি কাব্য, কি নভেল, প্রকৃত সাহিত্য মধ্যে সেই গুলিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালায় আর এক খানি প্রকৃত শিল্প-প্রসূত কাব্য আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বাল্মীকির জয়" কাব্যাংশে ও শিল্পাংশে এত উৎকৃষ্ট যে, বাঙ্গালায় তাহার তুলনা মিলে না। ফিক্তে যাহাকে Divine Idea বলেন,—অন্তর্জগতের যে সত্য শক্তি দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত—উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহার কতদূর এই ক্ষুদ্র—অথচ বৃহৎ কাব্যে প্রচার করা হইয়াছে! যদি বাঙ্গালায় শিল্পাংশে শ্রেষ্ঠ কোন কাব্য থাকে, তবে তাহা বাল্মীকির জয়। হেমবাবুর বৃত্রসংহারে এবং কতক পরিমাণে দশমহাবিদ্যায় শিল্পের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

অতএব প্রকৃত শিল্পী সচরাচর মিলে না। নভেলের সৃষ্টি শিল্পের উপর নির্ভর করে, তাই প্রকৃত নভেল মিলে না। আবার অনেক সময়ে প্রকৃত নভেল-লেখকগণও, নভেলকে ব্যঙ্গাত্মক করিতে গিয়া, অথবা তাহা নীতি শাস্ত্রে পরিণত করিতে গিয়া, শিল্পকে বিকৃত করিয়া দেন। তাই তাঁহাদের নভেল—আর প্রকৃত নভেল থাকে না। ইংলণ্ডের দুই জন প্রধান নভেল-লেখক, থেকারি ও ডিকেন্স, নভেলে ব্যঙ্গ ও নীতি মিশাইয়াই তাঁহাদের নভেলের প্রকৃত নভেলত্ব নষ্ট করিয়াছেন। টেন সাহেব এই পরম সত্য সম্বন্ধে বলিয়া-

ছেন,—"To transform novel is to deform it; he who like Thakeray, gives to the novel satire for its object, ceases to give it art for its rule, and all the force of the satirist is the weakness of the novelist."

আর এক স্থানে আছে,

"The studied presence of a moral intention spoils the novel, as well as the novelist." History of English Literature, vol. II. p 390-91.

আমাদের দেশে ব্যঙ্গাত্মক নভেল আজিও লিখিত হয় নাই। থেকারি ও ডিকেন্সের রোগ বাঙ্গালী নভেল-লেখকের মধ্যে বড় অধিক প্রবেশ করে নাই—সুতরাং সে বিষয়ের বিশেষ উল্লেখের আবশ্যক নাই। যাঁহাদের নভেলে শিল্পের আভাস আছে, তাঁহাদের নভেলে আজিও ব্যঙ্গ প্রবেশ করে নাই। কেবল ইন্দ্র বাবুর কল্পতরুতে, থেকারির অনুকরণে অনেকটা ব্যঙ্গের অবতারণা আছে—কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ শিল্প-চাতুর্য্য দেখান নাই।

তবে আজ কাল নভেলে নীতি কিছু অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকে নীতির অনুরোধে চরিত্রের দোষ গুলি এত অধিক অতিরঞ্জিত করেন যে, তাহা স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। যেমন ব্যঙ্গ চিত্রে (caricature) আমাদের গঠনের দোষগুলি সম্যক প্রকারে বর্দ্ধিতাকারে অঙ্কিত এবং অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হয়, কিন্তু চিত্র আদৌ স্বাভাবিক হয় না—তাহাতে প্রকৃত শিল্পের কোন পরিচয় থাকে না; সেইরূপ নভেলেও চরিত্রের দোষগুলি অতিরঞ্জিত করিলে—অথবা তাহার কেবল গুণের অংশ অধিক পরিমাণে দেখাইলে, সে চরিত্রের প্রকৃত চিত্র হয় না—তাতে প্রকৃত শিল্পের কোনই আভাস থাকে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি ত, নভেল-লেখক, ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ কিছুই দেখিবেন না, যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত জগতের প্রতিকৃতি—সংসারের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে যাহা মূল তত্ত্ব, তাহাই তিনি দেখাইবেন মাত্র। ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ভার পাঠকের। অতএব যাঁহারা সৎ অসৎ দেখাইতে যান, নভেলের মধ্যে গ্রন্থকারের আমিত্ব প্রবেশ করাইয়া দিয়া—পাঠকবর্গকে ভাল মন্দ বাছিয়া দেন—পাঠকদের উপদেশ দেন, সৎ চরিত্রের উপর সহানুভূতি, মন্দ চরিত্রের উপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতে বলেন, তিনি শিল্পকে নষ্ট করেন। তাঁহার নভেল প্রকৃত শিল্পীর সৃষ্টি নহে—তিনি ত সাধারণ সমালোচক—সাধারণ উপদেষ্টা মাত্র।

এই জন্য বঙ্কিম বাবুর আধুনিক নভেলগুলি শিল্পাংশে বড় সুন্দর হইতেছে না। আনন্দ-মঠ সুন্দর উদ্দেশ্য-মূলক নভেল হইলেও, তাহাতে প্রকৃত শিল্পের বড় অভাব। দেবীচৌধুরাণীতে অপেক্ষাকৃত শিল্পের আভাস থাকিলেও—তাহাতে নীতি ও উদ্দেশ্য এত অধিক পরিমাণে মিশাইয়াছেন,—art এর সহিত এত artificial মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে শিল্প বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যথা সময়ে ইহার উল্লেখ করিব।

নভেলের উদ্দেশ্য ও নীতির কথা বলিলাম—উপসংহার কালে কবির রুচি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে রুচি কথাটা আজ কাল সাম্প্রদায়িক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নহে—অথবা বিশেষ সাবধানে

তাহার উল্লেখ করিতে হয়। নীতিবেত্তাগণ সাধারণত যাহাকে রুচি বলেন—যাহা (obscene)কথার বিপরীত—ঠিক সে অর্থে প্রকৃত শিল্পীরা রুচি বুঝেন না। শিল্পীগণ জগতের সত্য মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা আর কিছুই দেখেন না, আর কিছুর অনুরোধে শিল্পকে বিকৃত করেন না। কিন্তু পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ত, মহাপুরুষগণ, প্রকৃত নীতিবেত্তাগণ বা শিল্পীগণের মধ্যে প্রকৃত রুচি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রভেদ থাকা উচিত নহে। 'Greatness of a harmful sentiment অথবা organised mechanism of a pernicious character.' এর মধ্যে যে সত্য আছে—তাহা দেখান যেমন শিল্পীর কার্য্য, তেমনি নীতিবেত্তারও কর্ত্তব্য হওয়া উচিত,—সত্য পরিহার করা কোথাও উচিত নহে। কেন না সত্য হইতেই জগতের উন্নতি। দেখ এক জন উচ্চদরের চিত্রকর,মৃত্যুশয্যায় শায়িত, নগ্নদেহ, এলায়িত বেণী—মৃত্যুযন্ত্রণায় মুখ বিকৃত—মৃত্যুশয্যার চারিপার্শ্বে স্বভাবের গম্ভীর ভাবে পরিবেষ্টিত, হস্তেস্থিত বিষধর দ্বারা বক্ষোপরি দষ্ট ক্লিওপেট্রার ছবি আঁকিয়াছেন *। মৃত্যুর কি চমৎকার—কি ভয়ানক দৃশ্য—মৃত্যু সময়ে মুখের কি আশ্চর্য্য ভাব-বিকাশ, ঐশ্বর্য্যক্রোড়ে লালিত বিলাসিনীর কি ভীষণ পরিণাম—চিত্রকর কেমন সুন্দর কৌশলের সহিত দেখাইয়াছেন। চিত্রে কি অসীম ভাব-সাগরের বিকাশ,—উচ্চ কল্পনাকে কেমন চিত্রে পরিণতি—চিত্র মধ্যে কি এক নূতন জগতের ভাবময় বিকাশ,—যিনি দেখিয়াছেন, তিনি যদি চিত্রের প্রকৃত শিল্প মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, তাহাতে নিহিত সত্য মধ্যে না ডুবিয়া, রুচির নিন্দা করেন—তবে তিনি এখনও জগৎ বুঝেন নাই—সত্যকে আদর করিতে শিখেন নাই—তিনি কখনও নীতিবেত্তা হইতে পারেন না। সজ্জন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যায়। পণ্ডিতবর কারলাইল রুচি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"Taste, if it means anything but a paltry connisseurship, must mean a general susceptibility to truth and nobleness; a sense to discern, and a heart to love and reverence, all beauty, order, goodness, wheresoever or in whatsoever forms and accopaniments they are to be seen." Carlyle's Essays. Vol. I. p. 34.

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

* কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির হলের পার্শ্বে পাঠকগণ এই উৎকৃষ্ট ছবি দেখিতে পাইবেন। শুনিয়াছি ইহার মূল্য বড় অধিক।

বিগত-স্মরণে। *

১

না জানি কিসের তরে বৃথা অশ্রু ঝরে রে!
গভীর হতাশা হতে, হৃদে সমুত্থিত চিতে,
অবশেষে আসি চক্ষু আকুলিত করে রে!—
শরতের মনোলোভা, হরিত ক্ষেত্রের শোভা,
নিরখি যখন আমি ব্যথিত অন্তরে রে,
যে দিন গিয়াছে চলি,আর না ফিরিবে বলি,
ঝরে অশ্রু সুখময় সেই দিন তরে রে!

* Translation of Tennyson's song—"Tears, idle tears—" vide the Princess, Canto IV.

ইন্দুবালা।

(উপন্যাস।)

কথন

দেন, আ

নার নিকট অসারতার পরিচয় দিতেছি। গুরো, আপনি জ্ঞানী, আপনি ত জানেন, উপদেশ দেওয়া কত সহজ, আর সেই প্রকার কার্য্য করা কত কঠিন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা স্মরণ রাখিয়া, এই হতভাগিনীর প্রতি নিতান্ত কঠোর আজ্ঞা বিধান করিবেন না। আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, আপনি যাহাই বলিবেন, আমি তাহাই করিব। * * *

আমরা দেখিতেছি, এই বিশ্বের ক্ষুদ্র বালুকণা হইতে অনন্ত আকাশ, সকলই কবিত্বময় ও আমোদদায়ক। * * আমরা যখন গভীর নিশীথে একাকী জীবন আলোচনা করি, তখন জগৎ কি সুখের বোধ হয়? সকলের কথা বলিতেছি না, হইতে পারে, লোক বিশেষে হয় না। আমরা কেন বুঝিতে পারি না যে, আমরাই আমাদের অসুখের কারণ? আমরা অবস্থা ভুলিয়া, জীবন ভুলিয়া, এক এক বিশেষ দ্রব্যে মোহিত হইয়া যাই—চেতন হউক, আর অচেতনই হউক। চেতন হইলে, কোন কোন স্থলে, সময় আমাদের একটু সুখী করিতে চেষ্টা পায়, অচেতন ত জীবনহীন। * * * * আমরা যাহা চাই, সৌরজগৎ তাহা বুঝে না,—দয়ালু ঈশ্বর তাহা দেন না; তথাপি আমরা জীবন-স্রোতে ভাসিয়া তাহা ধরিতে যাই, পাইলে সমুদায় ভুলিয়া থাকি, নিরাশ হইলে আঁধারে অসুখে নিমগ্ন হই। হতভাগ্য জীবনের এত বিপদ, তথাপি আমরা সামান্য সুখে গলিয়া যাই—এ সকল কেন? আমি বুঝিতে পারি না। আপনি আমাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও স্নেহভরে কতবার শিশু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাই বলি, এই শিশুর তরল মস্তিষ্ক এই সকল বুঝিতে পারে না, তাই—ব্যগ্র হইয়াছি, বুঝাইয়া দিবেন।

দিন আসে, চলিয়া যায়, থাকে না;—বলিলেও শুনে না কেন?—সময় থাকে না সত্য, কিন্তু জীবন এত দীর্ঘ,—ভবিষ্যতে কি হইবে? * * এক দুই করিয়া গণনায় যে শান্তি, তাহাও যদি না থাকে, তবে মনুষ্য কি উপায়ে বাঁচিতে পারে, জানি না। আমরা দিন গণি কেন? * * *

এ সকল লিখিয়া কি সুখ? শান্তি? তাহা পাইব কেমন করিয়া? কি চাই? কাহার নিকট? * * মনের অসুখ মুখে ভাসে কেন? * * * চক্ষু সকল সময় তাহার কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি * * ইচ্ছা বিরুদ্ধ আচরণ সকলেই করে।

কি লিখিলাম, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। সকলই ত আপনি জানেন। অন্যে আমাকে দূষিতে পারে, কিন্তু আপনি আমাকে দূষিলে, আপনি আমাকে ঘৃণা করিলে, আমি এই ভারাক্রান্ত জীবন রাখিতে পারিব না। এখানেই শেষ।"

শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে, পরিব্রাজক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এই প্রিয়লিপি পুন পুন পাঠ করিলাম, তথাচ ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না—স্থানে স্থানে প্রহেলিকাবৎ। এই পত্রের বাচ্য-বিষয়, অবশ্যই আমি। ইহা সুখময় বিপদ। আমি এখন পরিব্রাজক, ইন্দুবালা অন্য-পুরুষ বিবাহিতা—তথাচ এই দুর্ব্বোধ মন এই পত্র পাঠ করিয়া কেন আনন্দ অনুভব করিতেছে, গত জীবনের

ঘটনাগুলি কেন স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া মনকে অস্থির করিতেছে? 'আমরা আপনার অবস্থা ভুলিয়া এক এক বিশেষ দ্রব্যে মোহিত হইয়া যাই"—এই দ্রব্য কি আমি?—যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ কি? আর লিখিয়াছে—"এক দুই গণনা করার যে সুখ, তাহাও যদি না থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য কি উপায়ে বাঁচিতে পারে, জানি না"—ইহার অর্থ কি? কিছু কাল হইল, দুই মাস পরে প্রয়াগ যাইব, বলিয়াছিলাম। তা যাইলাম না। ইন্দুবালা সেখানে, তাহার সহিত এক্ষণও সাক্ষাৎ করিতে সাহস হয় না। মন উদ্বেল হইয়া যাইতে পারে—যে বাঁধ অনেক কষ্টে বাঁধিয়াছি, তাহা ভাসিয়া যাইতে পারে। আমি যাইব না। ভৃগুরাম গোস্বামী বোধ হয় প্রয়াগে আমার পিতৃব্যের নিকট এই সংবাদ দিয়াছেন। স্নেহময়ী ইন্দু তাহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে। যাহাই হউক, আমি যাইব না। কিন্তু ইন্দু যদি আমাকে এক বার দেখিয়া সুখী হয়, তাহা হইলে আমি যাইব না কেন? শিলাময় শৈলে থাকিয়া কি আমার হৃদয় এমনই পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছে? ইন্দু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দিন গণিতেছে—আর আমি যাইব না? আমার সুখ আমি ধরি না,—কিন্তু ইন্দু!—তাহার সুখের জন্য কি আমি এই তুচ্ছ প্রাণ দিতে পারি না? ইন্দুর সুখ—সুখ? ইন্দু কি এই সাক্ষাতে সুখী হইবে? এই ক্ষণকালস্থায়ী, ধর্ম্মশিক্ষাবিরুদ্ধ, বিপদজনক সাক্ষাতে ইন্দু কি সুখী হইবে?—ক্রমে পরিণামে, কি অপযশে ও অসুখে এককালীন ডুবিবে না? আমাকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, দক্ষিণা স্বরূপ তাহার দেবদুর্লভ হৃদয়ের অমূল্য স্নেহ পায়ের নিকট ঢালিয়া দিয়াছে—আর আমি জানিয়া শুনিয়া যাহাতে তাহার জীবনে কালিমা পড়িবে, তাহাই করিব? সে মুগ্ধ-স্বভাবা স্নেহ-প্রাণভূতা,—সংসার বুঝে না, বিপদ বুঝে না, ঈশ্বর ভালবাসিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সে ভালবাসিয়াছে—যাহাকে ভালবাসে, তাহার নিকট থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে দেখিতে চাহে,—সে মনে করে, তাহাতে দোষ কি? সংসার তাহাতে আপত্তি করিবে কেন? আর এমন অন্যায় আপত্তি করিলে আমরাই বা শুনিব কেন?—এমনই কথা যেন এক দিন বলিয়াছিল, এক্ষণও মনের ভাব যেন এই প্রকার। এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"ভালবাসা কি পাপ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহার অর্থ কি?" সে বলিল—"আপনি সাহসী পুরুষ, আমাকে আপনি ভালবাসেন, লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে ভয় পান কেন, আমার নিকটও সময় সময় গোপন করেন কেন? আমি যে আপনাকে ভালবাসি, তাহাত আমি কাহারও নিকট গোপন করি না, আপনার নিকটও করি না।" তখন তাহার বয়স অল্প, এখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভাব গুলি যেন একটুকু গাঢ় হইয়াছে, লজ্জাশীলতায় ভাষা একটু অপরিস্ফুট হইয়াছে,—কিন্তু সেই স্নেহ, সেই আত্মোৎসর্গ—আশ্চর্য্য—এই বালিকার সহিত আমার জীবন এমন জড়িত হইয়া যাইবে, কে ভাবিয়াছিল? আমারই জন্ম কোথায়, আর তাহারই বা জন্ম কোথায়? সে যাহা হউক, আমি যাইব না; আমি আমার

প্রিয় সম্বোধন করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে ত সুখের তরঙ্গ নাচিয়া উঠে নাই, তাহাতে হৃদয়-যন্ত্র মধুরস্বরে একদিনও ত বাজিয়া উঠে নাই। তবে ইন্দু, যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, তিনি নিজেতে নিজে মোহিত হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তুমি কি বুঝিবে? তিনি যাহাতে মোহিত, তিনি তাহাকে আপনা হইতে পৃথক মনে করেন না,—তাহা তাহার হৃদয়ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহা তাহার চৈতন্য বা চিন্তা বা অনুভব রূপে পরিণত হইয়াছে। দর্শনে আছে যে, এই বিশ্বজগৎ মনুষ্যের চৈতন্য মাত্র, বোধ মাত্র। এই বিশ্বজগৎ যে আছে, তুমি যে আছ, আমার নিকট তাহা আমার চৈতন্য, আমার বোধ, ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; আমি জন্ম গ্রহণ না করিলে, আমার চৈতন্য না থাকিলে, আমার নিকট তুমি বা বিশ্বজগৎ থাকিতে না"—এতদূর লিখিয়াই লিপিলেখক থামিলেন, ভাবিলেন, "কি লিখিতেছি? দার্শনিকদিগের মত এখানে লেখার কি আবশ্যক? এক দিন ইন্দুবালা বলিয়াছিলেন—"আপনার দর্শন-বিজ্ঞান সকল সময় কাযে আসে না," সত্য। কি লিখিলাম দেখি, এই বলিয়া পত্র খানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন, পড়িয়া বলিলেন—"কি ছাইভস্ম লিখিয়াছি? অনেক অসঙ্গত ও অনাবশ্যক কথা লিখিয়াছি। আমি অনেক দিন সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া যেন মনের ভাব প্রকাশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—তাহা ভুলিয়া গিয়াছি—আর কিই বা লিখিব; যাহা লিখিবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়, তাহা বিবেক অনুমোদন করে না, তাহা লিখিতে পারি না, সুতরাং তাহা সুখের হয় না—" এই বলিয়া পত্র খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন—পূর্ব্বগগন প্রান্তে গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়া শুধাংশু উদিত হইয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর তুহিনাবৃত গিরিশৃঙ্গ রজত-কিরণে বিভূষিত হইয়া, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত করিয়া, এক ঐন্দ্রজালিক-দীপ্তিময়ী মধুরিমার অবতারণা করিয়াছে; আকাশ নির্ম্মল,—বিস্তৃত চন্দ্রমা-বিভাসিত, নক্ষত্র-খচিত, কচিৎ বা লঘু শ্বেতাম্বরমালায় শোভিত। এই রূপ নিসর্গ-শোভা সন্দর্শন করিয়া পরিব্রাজক, ক্ষণকাল, সেই ধবল মধুর জ্যোতি-ধৌত পর্ব্বতশোভা একদৃষ্টিতে দেখিলেন,—পরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি সুন্দর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—ইন্দু, তুমি কোথায়? আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি আবার কুটীরে প্রবেশ করিলেন,—"আজ আর পত্র লিখিতে পারি না" বলিয়া শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল পরে "হরিহর" বলিয়া ডাকিলেন। হরিহর প্রভুভক্ত দাস। সে আসিল, দেখিল, প্রভুর মুখ মেঘাচ্ছন্ন,—চক্ষু মুদ্রিত, ভ্রূকুঞ্চিত; বুঝিল, তুফান উঠিয়াছে। সঙ্কুচিত ভাবে শয্যার পাশে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল,—দীপালোকে দেখিল যেন ললাটে—অনবরত একটী চিন্তার পশ্চাতে আর একটী চিন্তা ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, হৃদয় ঘন ঘন সঙ্কুচিত, আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে, মুখ রক্তিমবর্ণ, হস্তপদাদি স্পন্দহীন। ভৃত্য দুঃখ-মিশ্রিত বিস্ময়ের সহিত নিরুপায় হইয়া প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল। অনেকক্ষণ পরে পরিব্রাজক আবার সক্রোধে

প্রাচীন ।

তখন প্রজাসংখ্যা কত ও আয় ব্যয় কিরূপ ছিল, হয়ত তাহা আমরা আর জানিতে পারিব না। এ সকল সংবাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যাহা না পাইব, তাহার জন্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা পরিত্যাগ করি কেন? বিশেষত যে সকল অমূল্য সত্য এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার মূল্য সামান্য নহে; যাহা হারাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা তাহাদের মূল্য অনেক অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে সমাজের অবস্থা কিরূপে ক্রম বিকশিত হইয়াছিল, কোন্ যুগের আর্য্য জাতির অবস্থা কিরূপ ছিল, কি ভাবে আর্য্য হৃদয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলোড়িত হইয়াছিল, কি চিন্তায় পূর্ব্বপুরুষগণের মস্তিষ্ক কুঞ্চিত হইত, কিরূপে কৃষিচারী হলস্কন্ধ মহাপুরুষেরা সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মহাসূত্র উদ্ঘাটন করিলেন, প্রেত-পূজিত মহাদেশে কিরূপে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় সম্ভব হইল,—যেদেশে "ধর্ম্ম গচ্ছামি সংঘং গচ্ছামি" বলিয়া পুরস্ত্রী হইতে মাঠের চাষা পর্য্যন্ত, রাজপুত্র রাহুল ও কুণাল হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত চিৎকার করিত,—মহিষী যশোধরা ও কাঞ্চনমালা হইতে নগরবাসিনী বারাঙ্গনা পর্য্যন্ত যে দেশে সহস্র সহস্র বৎসর শাক্যসিংহের সুনাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই দেশে কিরূপে ওলাবিবি ও সত্যনারায়ণের পূজা আসন অধিকার করিয়াছে—ভারতে তাহার ইতিবৃত্ত নাই। অথচ ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির সামাজিক ইতিহাসের উপকরণের অভাব নাই। যত্ন, ধীরতা ও বুদ্ধির সহিত সংগ্রহ করিতে পারিলে, এমন পারিজাত হার গাঁথিতে পারা যায়, যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত লোক পরিতৃপ্ত হইতে পারে। ভারতে প্রাচীন গ্রন্থের অভাব নাই। যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহাদিগকে হিসাবে না ধরিলেও বলা যাইতে পারে, এত অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থাবলী পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই—অন্তত আছে বলিয়া আমরা অদ্যাপি শুনি নাই।

এই রাশি রাশি গ্রন্থ মন্থন করিয়া অমৃতের সঞ্চয় করা সহজ নহে, অস্বীকার করি না। যাহা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্য নহে, শতজনে মিলিয়া চেষ্টা করিলে তাহা না হইবে কেন? যাহা এক জনের জীবন কালে সম্পূর্ণ না হইবে, তাহা বংশ পরম্পরায় চেষ্টা করিলে কেন হইবে না? কোথায় মিসর, কোথায় গ্রীশ, আর কোথায় বা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের লোকেরা টাকা সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিত পাঠাইয়া, পাতাল আলোড়ন করিয়া মিসরের প্রাচীন কাহিনী ও হোমরের পূর্ব্বতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহে সমর্থ হইতেছে; আর ভারত আমাদের জন্মভূমি, দেশে পণ্ডিতের অভাব নাই, সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে ভারতের প্রাচীন কাহিনী সংগ্রহ করা যায় না? বিলাতের লোক সভা করিয়া পণ্ডিত পাঠাইয়া বিদেশীয় বনচারী বর্ব্বরদিগের সমাজরহস্য সংগ্রহ করিয়া সমাজতত্ত্ব উদ্ভাবন করিতেছে; আর আমাদের শরীরে যাঁহাদিগের রক্ত,—প্রাণে যাঁহাদিগের প্রাণ, তাঁহারা কিরূপ থাকিতেন, কি করিতেন, তখন দেশের ও সমাজের কি অবস্থা ছিল, আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব না?—এ কথা বলিতে মনে আনিতেও লজ্জা বোধ হয়।

বেদ সকল ক্রমে ক্রমে সংগৃহীত হইতেছে, পুরাণ সকল সুপ্রাপ্য, রামায়ণ ও মহাভারত সকলেই পড়িতেছেন, বৌদ্ধ

পিটক সকল সংস্কৃত ও পালি ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে, প্রাচীন সংহিতা ও আধুনিক স্মৃতি সকল সহজেই সংগ্রহ করা যায়, জৈন-গ্রন্থ অপ্রাপ্য নহে, প্রাচীন শাসন ও মুদ্রা অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, এখনও কি ভারতের একখানি ইতিবৃত্ত সংগ্রহের সময় হয় নাই? কেবল কোথায় আর একখানি রাজতরঙ্গিনী, রাসমালা, রাজস্থান, বা বিক্রমাঙ্ক-চরিত প্রকাশিত হইবে, সেই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিব? দর্শন ব্যাকরণ, সাহিত্য অলঙ্কার, যাহা ধর, তাহা হইতেই ঐতিহাসিক সত্য চয়ন করা যাইতে পারে।

বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যদি তাহা অপেক্ষা আর একটু বিস্তৃত ভাবে, নিজ মতের ঘোষণা অপেক্ষা ঐতিহাসিক ঘটনা আর কিছু দিয়া, ইউরোপীয়দিগের দোহাই না দিয়া, আপন বুদ্ধির আর একটু অধিক চালনা করিয়া, কেহ পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ সকলের সার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন,—যদি দশজন কৃতবিদ্য উৎসাহী লোক এই পথে চেষ্টা করেন, তবে সময়ে কেন শুভফল লাভ হইবে না, তাহা বুঝি না।

এই সকল সার সংগ্রহ পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া, আর একটী মহৎ কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে। কে কাহার আগে বা পরে, ইহা লইয়া যে ঘোরতর কলহ প্রত্নতত্ত্ববিৎ-সমাজে এখন চলিতেছে, সমাজের ক্রমবিকাশ স্তরে স্তরে অনুসরণ করিতে পারিলে, তাহার শান্তি হইবার সম্ভাবনা। এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ নাম দেখিয়া, ভাষার তুলনা করিয়া, বা কে কাহার উল্লেখ করিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া, এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাস কোথাকার লোক, কোন্ সময়ের লোক, আজি পর্য্যন্ত তাহা মীমাংসা হইল না,—অথচ, শকুন্তলা ও মেঘদূত, রঘু ও কুমার অন্তত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী পাঠ করিয়াছে। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, ইহা শুনিয়া পূর্ব্বতন লোকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, —কিন্তু কে শত্রুতা সাধিয়া, প্রমাণ করিল, —বিক্রমাদিত্য এক জন নয়, সাত জন; বিক্রমাদিত্য নাম নয়, উপাধি। অমনি মনের ভিতর ঝড় বহিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে, কাহাকে কাহার মাথায়, কাহাকে কাহার পায়ে বসাইব, কিছুমাত্র স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। এখন এই পথটা এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না কি? অষ্টবিংশতিতত্ত্ব অধুনা বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের মতে স্মৃতিশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইয়াছে। মনুসংহিতা একেবারে নির্ব্বাসিত হয় নাই সত্য বটে, কিন্তু ব্যবহারে মনু অপেক্ষা রঘুনন্দনের নাম কিছু অধিক সময় শুনিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গীয় বুধগণ মনু অপেক্ষা আপস্তম্ব, গৌতম, বৌদ্ধায়ণ, বশিষ্ঠ ও বিষ্ণু সংহিতা অধিক প্রাচীন বলিয়া থাকেন। বৃদ্ধ মনুর বৃহৎ মানব সংহিতা বর্ত্তমান মনুসংহিতা কি না, মনুসংহিতা প্রকৃত পক্ষে ভৃগুসংহিতা কি না, বর্ত্তমান মনুসংহিতা প্রাচীন সংহিতার সার সঙ্কলন কি না, এ সকল বিষয় আমরা এক্ষণ আলোচনা করিব না। উপরে উল্লিখিত অভিপ্রায় মত, আমরা সময়ে সময়ে, নব্যভারতে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রাচীন আর্য্য-সমাজের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে চেষ্টা

করিব। অত্রি, হারীত প্রভৃতি সংহিতা সকল হইতে তাৎকালিক সমাজতত্ত্ব সংগৃহীত হইলে, মনু ও তাহার পরে অষ্টবিংশতি তত্ত্বে হস্তক্ষেপ করা যাইবে। তদনন্তর ঐ সকল সার সংগ্রহের তুলনা করিয়া, কে কাহার আগে বা পরে, স্থির করিতে চেষ্টা পাওয়া যাইবে।

যদি অপরে অন্যান্য গ্রন্থ সকলের এইরূপ সার সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করেন, আমরা বাধিত হইব। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য, শ্রীমদানন্দ গিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ, শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দ গিরির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সহিত। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত—প্রথম সংখ্যা। সমস্ত গ্রন্থের মূল্য ৩২ শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ২॥•। এই প্রাচীন ধর্ম্মভাব-পূর্ণ গ্রন্থ খানি ভারতের এক অমূল্য রত্ন;—ভক্তি-পিপাসুদিগের একমাত্র আশা-বারি-বিন্দু। এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের এক অপরূপ পরিচয়। যিনি এই গ্রন্থ একবার পড়িয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মের মোহিনী শক্তিতে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, ধর্ম্মের অনাবিল জ্যোতিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কত পাপাসক্ত, দুষ্কর্ম্ম-রত চিত্ত যে এই গ্রন্থের শীতল ছায়ার আশ্রয় লাভ করিয়া জীবন পাইয়াছে, এই বিস্তৃত ভারতে তাহার গণনা হয় না। এই দুর্দ্দিনে,—এই জড়-পূজা বা অবিশ্বাস-পূজার দিনে, এরূপ প্রকাণ্ড রত্ন-খণ্ডকে যিনি অতি সুলভ মূল্যে সর্ব্ব সাধারণের হস্তে দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তিনি যে সকলেরই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এই গ্রন্থ এত দুষ্প্রাপ্য ছিল যে, বহু কষ্ট, বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও পাওয়া যাইত না। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের জীবন ধন্য হউক, তাঁহার পরিশ্রম সফল হউক।

প্রথম সংখ্যার ছাপা ইত্যাদি সকলই পরিপাটী হইয়াছে। কৈলাস বাবুর অনুগ্রহে, এই দুষ্প্রাপ্য বহু মূল্য গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ অবস্থায় হস্তে পাইলে, ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে আমাদের একান্ত বাসনা রহিল।

২। প্রসবতত্ত্ব।—নূতন বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।•। আমরা এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। যদিও প্রসব-তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তবুও ইহা পাঠে এই গভীর অত্যাবশ্যকীয় তত্ত্ব সাধারণের কতক হৃদ্‌বোধ হইতে পারিবে। পুস্তক খানির ভাষা সহজ হইয়াছে।

৩। নবকবিতা।—শ্রীমুকুন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, এম, এ, বিরচিত, মূল্য ॥•। বঙ্গের সুশিক্ষিত কৃতবিদ্যগণ জাতীয় ভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন, ইহা দেখিলে কাহার মনে না আশা-আনন্দ সঞ্চারিত হয়? নবকবিতা পাঠে গ্রন্থকারের উৎসাহ ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আমরা সুখী হইলাম। পদ্যাংশে পুস্তকখানি উচ্চ দরের না হইলেও, সুরুচি-

সৌন্দর্য্যে তোমার নিকট এখন সুশোভিত। বৈশাখী পূর্ণিমা কতবার গিয়াছে, কোকিল-ঝঙ্কার কতবার শুনিয়াছ, দখিয়ালের সুকণ্ঠ-সঙ্গীত, কুসুমের কোমলকান্তি, সৌদামিনীর তড়িতগতি কতবার দেখিয়াছ, কিন্তু এত সুন্দর, এত মোহন, এত প্রাণভরা আর কখন দেখ নাই। কল্পনা স্নেহ প্রীতি পূর্ব্বে বিস্তৃত ছিল, এখন বিশাল হইয়াছে। বুকের ভিতর জগতটা টানিয়া লইতে পার, সকলকেই বুকে তুলিয়া বুকটা শীতল করিতে চাও। তুমি প্রেম, শান্তি, পবিত্রতার এতদিনে আস্বাদ পাইয়াছ, অমর হইতে চলিয়াছ, বুঝিলাম। আগে যাহাকে ঘৃণা করিতে, এখন তাহাকে দয়া কর, আগে যাহাকে শত্রু বলিতে, এখন তাহাকে প্রীতি কর; আগে যাহাকে শিষ্য বলিতে, এখন তাহাকে গুরু বল; আগে যাহাকে উপদেশ দিতে, এখন তাহার উপদেশ লও। তোমার শিক্ষার অহঙ্কার ভাঙ্গে নাই, প্রেমে কোমল হইয়াছে। আগে চমকিত করিতে এখন চমকিত হও; আগে উন্মত্ত করিতে এখন বিহ্বল; আগে নাচাইতে এখন আবেশে মুদিত; আগে আপনার ছবি জগতের ললাটে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতে, এখন অন্যের ছবি হৃদয়ে এমনি সাবধানে ধরিয়াছ যেন না টলে। তুমি যুবা ছিলে বালক হইয়াছ, যৌবনের উদ্দামতা কমিয়া বালকের কোমলতা পাইয়াছ; যৌবনের তেজস্বিতা গিয়া বালকের লাজা-য়িতা আসিয়াছে। ভাই, তুমি কি অমূল্য-রত্ন পাইয়াছ, বুকের ভিতর লুকাইয়া আপনি একা দেখিবে, সদা সতর্ক, যেন আর কেহ না দেখে; বুকের উপর কিসের দাগ পড়িয়াছে লুকাইতে চাও, যেন অপবিত্র চক্ষু তাহার উপর না পড়ে। যেন পাপীর নিশ্বাসে তাহা কলঙ্কিত না হয়। ভাই, তুমি এখন অন্যমনা। আগে প্রত্যুৎপন্ন ছিলে, এখন দশবার ডাকিয়া উত্তর মিলে না; আগে সকল কথাই আপনি বলিতে, এখন একটা কথা ফুরাইতে পারিলে সুখী হও। অন্যে কথা কহিতে লাগিলে যেন আনন্দে অবসর লও। হৃদয়ের ভিতর দেবতা, তাই চক্ষু মুদিত; বাহিরে দেবতা তাই চক্ষু উন্মিলিত; সর্ব্বব্যাপী দেবতা তাই স্থিরদৃষ্টি অসীম—দিবানিশি ধ্যান-মুগ্ধ। সেই বীজমন্ত্র গোপনে দিবানিশি জপ কর, তুমি সেই শক্তি প্রভাবিত, সেই প্রকৃতি পরিণত, সেই পরিতৃপ্তি পরিবর্তিত—তুমি তন্ময়।

নাচিনে মানুষ নিমিখ নাই,
কাঠের পুতলি রহিছে চাই।

তাহার কথা বলিতে চাও না, ভাবিতে চাও, শুনিতে চাও। তাহার মত কে তাহা বল, সে কে তাহা বল না; নিজে সে নামটী মুখে তুলিতে পুলকিত হও।

অন্যে তাহার নাম করিলে তুমি কম্পিত হও,—সে কম্পন হিংসা জনিত নহে, ভয় জনিত—তুমি গোপনে গোপনে তাহার নামটী যখন জপ কর, তখন সে নামটী আমি আড়ি পাতিয়া শুনিয়াছি। পাছে আমার ওষ্ঠস্পর্শে—তোমার সেটী কলঙ্কিত হয়, আমি সে নামটী মুখে তুলিতে সাহস করিলাম না। কিন্তু ভাই, তিনি তোমার কে?

তোমার ভাবের স্থিরতা নাই। আবর্ত্ত-তাড়িত সরসীহিল্লোলের ন্যায় বিভিন্ন মুহূর্ত্তে তুমি বিভিন্নমূর্ত্তি। বিষণ্ণ হৃদয়ের প্রান্ত প্রদেশ কখন প্রদোষ ভানুর কনক-

রঞ্জিত, কখন চন্দ্রিকার ছায়াময় কিরণে স্বপ্নাচ্ছন্ন। জীবন্ত অনলগিরি কখন সুপ্ত, কখন উচ্ছ্বসিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্ব্বতের রোষ-কশায়িত শৃঙ্খল মাত্র আতঙ্ক জনক। তোমার কোন বায়ুরোগ হইয়াছে। ভয় নাই তুমি ভীত, ত্রাস নাই তুমি ত্রস্ত, উল্লাস নাই তুমি হসিত, শীতে তুমি উত্তাপিত, গ্রীষ্মে তুমি কম্পিত, "পীনতনু ক্ষীণ ভেল, হার ভেল ভার, ফুল ভেল শূলসম উলট ব্যবহার।" রোগ ভিন্ন ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসের অত বায়ু আর কে যোগাইতে পারে?

তোমার অন্যমনস্কতা ভাঙ্গাইতে কত চেষ্টা করিলাম, ভাঙ্গাইতে পারিলাম না। যাহাদিগের সংসর্গে কত আনন্দ পাইতে, তাহারা আসিল, কিন্তু তোমার আবেশ ভাঙ্গিল না। তুমি যে শাস্ত্রালোচনায় প্রভূত আনন্দ ভোগ করিতে, সে শাস্ত্র-কথা পাড়িলাম, তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না। অপরে বুঝিল না, প্রাচীন চতুরতায় তাহাদিগকে প্রতারিত করিলে, কিন্তু ভাই, আমাকে ঠকাইতে পার নাই, বলিয়াছিত আমি জাতি বৈদ্য, লক্ষণ-তত্ত্বে সুপণ্ডিত। দুই একবার তুমি আবেশ ভাঙ্গিতে এক মুহূর্ত্তের জন্ম জাগিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু পারিলে না—তুমি দুর্ব্বল মন্ত্রমুগ্ধ, নিদ্রিত, স্বপ্ন প্রয়াণের ন্যায় তোমার চেষ্টা বিফল—"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়?"

সামান্য ধনে যাহারা ধনী তাহারা ধনের বড়াই করে। তোমার লব্ধধন কোহিনূর গর্ব্বের উচ্চতার উচ্চে, তুমি ফলভরে অবনত, ভিখারী বেশে ভিখারীর দলে মিশিতে চাও। একি অপূর্ব্বভাব! যাহাদের মানসচিত্র অস্ফুট, মুছিয়া যাইবার ভয় থাকে, তাহারা প্রতিকৃতি সঙ্গে করিয়া রাখে, মুমূর্ষু অবস্থায় বিষবড়ি প্রয়োগ করিবে। যাহারা ভাবে ভোর, তাহারা সুরাপান তুচ্ছ করে। ভাই তুমি মাতাল, নেশায় ডুবিয়াছ, মানস চিত্রের উজ্জ্বলতায় বাহ্যিক সাহায্য উপেক্ষা করিতে পারিয়াছ, স্বাবলম্বী হইয়াছ, আপনাতে আপনি পূর্ণ অথচ বিনীত। তোমার এ দেবভাব আর কখন দেখি নাই। তুমি তপস্বী হইয়াছ, সদাই ধ্যান নিমীলিত নেত্র,—কিন্তু সন্ন্যাসী নহ। স্বতন্ত্র নির্জ্জনপ্রিয় কিন্তু বনবাসী নহ। তোমার সে বৈরাগ্যভাব কোথায় গেল? এখন আপনার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। আগে আমাদের ভাল বাসিতে, এখন আপনাকে ভাল বাস। আগে আমরাই তোমার সর্ব্বস্ব ছিলাম, এখন তুমি তোমার সর্ব্বস্ব হইয়াছ। তুমি নূতন যোগী, তোমার যোগে আত্মপীড়ন, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য নাই, অথচ বিলাস বিজয় উল্লাস নাই। তুমি যোগী রামানন্দ, চৈতন্যের গুরু; বিলাসী সন্ন্যাসী, গৃহস্থ বৈরাগী, আত্মপ্রিয় যোগী। এ কর্ম্মযোগ নহে, জ্ঞান যোগ নহে, আমার নিদানে ইহার সংজ্ঞা প্রেমযোগ। অনুমানটী কি ঠিক হইয়াছে ভাই?

তোমার

* * *

(২য়)

ভাই, আমি দেব পূজায় মত্ত, আমি রাজ যোগে যোগী! ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বরের জগত্ প্রেমময়! সকলেই সকলকে চাহে, কেহ কাহাকে প্রত্যাখ্যান করে না। প্রত্যাখ্যান প্রেমের বিরহ, প্রেম বৈচিত্র্য মাত্র, প্রেমের রূপান্তর। প্রেমের রূপান্তর বল,

বলের রূপান্তর তেজ, তেজের রূপান্তর জ্যোতিঃ, জ্যোতির রূপান্তর তড়িত, তড়িতের রূপান্তর প্রাণ। মাধ্যাকর্ষণ বল, সংযোগাকর্ষণ বল, বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল, সকলই প্রেমের আকর্ষণ, প্রেমের রূপান্তর। "যে যাহারে ভাল বাসে, সে তাইবে তার সাথে।" প্রেমে জগত্ সৃষ্ট বলিলে ভাব ফুরায় না, প্রেমে জগত্ প্লাবিত বলিলেও তৃপ্তি হয় না, প্রেমই জগত্। পশু, পক্ষী, লতা, পাতা, চাঁদের আলো, মেঘের ছটা, পাখীর গান, ফুলের বাস, শিশুর হাসি, নদীর খেলা, মেঘে সৌদামিনী কেন জড়িত? পর্ব্বতে কুয়াসা কেন শায়িত, হরিণী কেন বায়ুর সঙ্গে ছুটে? চকোর কেন বুক ভাসায়ে গগন-সাগরে সাঁতার খেলে, কাহে সে ভঁওরা ফুলে ফুলে বুলে?—এসব প্রেমের খেলা। গা খেলিয়া বায়ুটী যেই বহিল, অমনি তালে তালে পাতা গুলি নেচে উঠিল; কুসুমের সৌরভটী যেই ছুটিল, অমনি গুণ গুণ গুণ, মেঘরাজ চাঁদপানা মুখখানা যেই দুই হাতে চাপিয়া ধরেন; অমনি বজ্রস্বরে পাখী "নৌবত বাজে"। উষার আভাষ না পাইলে কি দধিয়ালের সুকণ্ঠে টৌরিস্বর বাহির হয়? ঈশ্বর প্রেমময় নহেন, ঈশ্বরই প্রেম, ঈশ্বরই রস, বিশ্বময় রসময়।

তাই, প্রেমিক বিনা কেহ কি কাঁদিতে পারে? যে না কাঁদিয়াছে, সে প্রেম চিনে না। যার প্রেম যত অধিক সে তত কাঁদে, যে না কাঁদে সে পাষাণ না। পাষাণেরও প্রেম আছে, হৃদয় আছে, নহিলে সেহাহা এত সোহাগ করিবে কেন? নহিলে সে জোণাপানো রথটী দেখিলে বুকটী পাতিয়া লইবে কেন, যা লইবে তা যতনে পোষিবে কেন? বলিয়াছি প্রেমময় মিদং জগৎ—যাহা আছে, যাহা ছিল, যাহা হইবে, যাহা বস্তু, যাহা বিদ্যা সকলই প্রেমময়, তাই প্রেমের কবি গাহিয়াছেন,—ন্যানতো বিদ্যাতে ভাব, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ—। শিশু জন্মিয়াই কাঁদে, নির্ঝর জন্মিবামাত্র ঝির ঝির করে, সেই যতদিন তাহার প্রেমের পথ খুলে। তার পর যত বয়োবৃদ্ধি তত প্রেম বৃদ্ধি, শেষে সাগর সঙ্গমে মহাপ্রস্থান, দানসাগর। সরিৎ, সরসী, তড়াগ, নদী, কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী বা জননী একই মহাসাগরের রূপান্তর। অল্প হইতে অধিক, মাত্রার ইতর বিশেষ, প্রেমোদধির সোপান পরম্পরা, সেই উদধি বিশাল, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, বিশ্বময়। দর্শন বিজ্ঞান যেখানে পরাস্ত, প্রেম-শাস্ত্র যেখানে মুক্তপক্ষ; দ্বৈতবাদ অশাস্ত্র, অদ্বৈতবাদ একমেবাদ্বিতীয়ং একমাত্র সত্য। বিশ্ব নাই, জগত নাই, তুমি নাই, আমি নাই, সৎ নাই, অসৎ নাই, বস্তু নাই, ছায়া নাই, মায়া নাই, মোহ নাই, বিষাদ নাই, বিসম্বাদ নাই—সকলই প্রেম স্বরূপ, রস স্বরূপ "তত্ত্বমসি শ্বেত কেতু" "সোহহং" একমাত্র, অক্ষর, অব্যয়, অনাবিল সত্য, দেহ অঙ্গ নাই, হস্ত পদ নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, বৃক্ষ লতা নাই, সকলই সেই, সকলই সেই এক। স্ত্রী পুত্র নাই, ভ্রাতা ভগিনী নাই, মাতাপিতা নাই, আত্মীয় পর নাই, আমার তোমার নাই—সকলই সেই এক, লিঙ্গ শূন্য, বর্ণ শূন্য, বিকার শূন্য 'তৎ'। তুমি আমি সকলই তাহার, পুত্র কন্যা সকলই তাহার, আমার যাহা কিছু সকলই তাহার। তৎসৎ, আর সব মিথ্যা। যাহা সৎ তাহাই তৎ, যাহা তৎ নয় তাহা নয়, নাই, হইবে না। ভাবশূন্য অসৎ। যাহা

তৎ তাহাই ভাবময়। বিদ্যা রূপবতী, রূপবতী রসস্বরূপা প্রকৃতি প্রেমময়ী। প্রেম আদি, প্রেম অন্ত, এক প্রেমই সৎ; অসচ্ছনেরাই অপ্রেমিক।

বিবর্ত্তবাদের মূলসত্য প্রেম। উত্তরাধিকার বল, আপেক্ষিক বিকার বল, প্রেমের রূপান্তর। শরতের নিষ্কলঙ্ক জোছনা, কুসুমের কোমল কান্তি, কাদম্বিনীর গাম্ভীর্য্য, সৌদামিনীর প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করে, প্রেম বশাৎ; পিতার প্রখরবুদ্ধি, পিতামহের তেজস্বীতা আমি লাভ করিয়াছি, প্রেম বশাৎ। প্রাচীন বিবর্ত্তবাদীগণ পার্থিব প্রকৃতির বৈসাদৃশ্যে চমকিত হইয়া বিবর্ত্তবাদ উদ্ভাবন করেন। আধুনিক বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির সাদৃশ্য-মোহিত। আজন্ম প্রত্যেক জীবাণু শত কোটী বিভিন্ন কারণ প্রভাবিত, প্রত্যেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত, তথাপি জগতে এত সাদৃশ্য-কেন? পাতায় পাতায়, লতায় লতায়, চোখে চোখে, হাতে হাতে, মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, এত সাদৃশ্য কোথা হইতে? পূর্ব্বপণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিতেন, একই কারণে একবিধ পদার্থ ভিন্ন পথে চলে কেন, এখনকার পণ্ডিতগণ বুঝাইতেছেন, ভিন্ন কারণে ভিন্ন বিধ পদার্থ একই পথে চলে কেন। ব্যাখ্যা উভয়ের একই—Tendency—! তুমি আমি ভিন্ন গৃহে ভিন্ন ভাবে পরিপোষিত, অধিকার ভিন্ন, শিক্ষা ভিন্ন, সংসর্গ ভিন্ন, অথচ দুইজনের সাদৃশ্য এত অধিক, পাক এমনি পড়িয়াছে যে পাশাপাশি হইবা মাত্র দুই জনে জড়াইয়া গেলাম, একে বারে প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে জড়াইয়া গেল। এমনটা কি প্রকারে হইল বল দেখি?

বিবর্ত্তবাদের প্রধান আচার্য্য ডারবিন এই (Tendency) বা প্রবণতা দ্বারা চেতন অচেতনের প্রভেদ করিয়াছেন; এই প্রবণতা জীবোৎপত্তির কারণ, কীটাণু হইতে নীচতর যে বিশ্বাণু, তাও এই প্রবণতা প্রভাবিত। সেই প্রবণতা কালক্রমে পুরুষের তেজ, সতীর প্রেম, বালকের হাসিতে পরিণত হইয়াছে। সে প্রবণতার উৎস কোথায়? অন্ধতম কুটীরের গভীরতম প্রদেশে অগ্রসর হইয়া ডারবিন পুরোভাগে পাদক্ষেপ করিতে আর সাহস করেন নাই। এই স্থান হইতে তিনি পরাঙ্মুখ। কাব্য এখানে অগ্রসর হয়, এই Tendency সেই বিশ্বপ্রেমের অংশ। প্রেম (Tendency) হইয়া জীবন কোষ অনুপ্রাণিত করে, ক্রমে বিকাশের পর বিকাশ; আবার, বিকাশ, বিশ্ব বিশাল সহৃদয়তায় পরিণত হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য সকল শাস্ত্রের কুটিলরহস্য প্রেমমন্ত্রে সরল সহজ, স্মিতানন। এমন সোণার চাবি পিটর পান নাই, এই চাবিতে ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সকলই উদ্ঘাটিত হয়। ইহাই সেই সঞ্জীবনী সুধা। নদীর বাঁধ কাটিয়া দাও, সে ছুটিয়া সাগরে পৌছিবে; হরিণীর শৃঙ্খল ভগ্ন কর, সে বায়ুচারিত বনভূমে পলায়ন করিবে; পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া দাও, সারিকা গগন মুখে ধাবমান হইবে; শিশুর গতি মায়ের ক্রোড়ে, মরালের গতি মানসহ্রদে, পৃথিবীর গতি সূর্য্য পার্শ্বে, বিশ্বের গতি প্রেমের অনন্ত মণ্ডলে। কেবল মায়ার চক্ষু অন্ধ করিয়া মনুষ্যকে জড়পথে পাতিত করে। মোহ আবরণ খুলিয়া লও, "হাবিকার বেড়ী ভাঙ্গ", কৃত্রিমতা, অস্বাভাবিকতা, সামাজিকতা, কাপুরুষতা, প্রতারণা, মৌখিকতা কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইয়া দাও, জগত্ সুস্থ হইবে, প্রকৃতিস্থ

হইবে, রসাল হইবে, পবিত্র শুদ্ধ সুধাময় প্রেমে সকল প্রফুল্ল হইবে। সেই প্রফুল্লতার নাম যৌবন। বিশ্ব চিরযৌবন লাভ করিবে। তখন চাঁদের আলোকে আর এক ছটা, ছায়াপথে আর এক শোভা, নীলাকাশে আর এক রূপ, পাখীর কণ্ঠে আর এক স্বর, ফুলের সৌরভে আর এক গন্ধ, নদীর কল কলে আর এক শব্দ, মায়ের স্নেহে আর এক রস, প্রণয়ে নূতন মধু, হৃদয়ে নূতন বল, দেহে নূতন কান্তি, চক্ষে নূতন জ্যোতি দেখা দিবে; বিশ্ব নবরূপ ধারণ করিবে; কল্পনা তার অন্ত পায় না, কবিগণ তাহাকেই স্বর্গ বলিয়া চিত্র করেন।

সেই পৃথিবী স্বর্গ, সেই স্বর্গ দেবতা, সেই দেবতা ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর প্রেম, তখন অদ্বৈতবাদ বুঝিতে আর বাধা থাকে না। মনুষ্য কর্ম্মফলে অচিন্ত্য চিন্তা করিতে পারে না, অব্যক্ত অনুভব করিতে পারে না, ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় অগ্রাহ্য বলিতে বাধ্য হয়। মহাসাগরের বিশালতা তাহাকে স্তম্ভিত করে, তুঙ্গ তরঙ্গের চঞ্চলতা তাহাকে ত্রাসিত করে স্বাভাবিকতা তাহার নিকট কৃত্রিম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দুর্ব্বল মনুষ্যের এই হীনতা অতি শোচনীয়। অথচ তাহারা তাহাতেই গৌরব করে। গোলামের জাতি গোলামি করিতে গর্ব্ব করে। শৃঙ্খলকে অলঙ্কার বলে। সে সুধা বলিয়া বিষ পান করে, স্বর্গ বলিয়া নরক খোদন করে, নরককে গৃহ বলে, দাসীকে স্ত্রী বলে, মৃত্যুকে পুত্র বলে, কীটকে কুসুম বলে, কুসুমকে পদতলে দলন করে। বিকৃত রাক্ষস যাহাকে সুস্থ দেখে তাহাকে সমাজ চ্যুত করে; স্বভাব তাহার ঘৃণিত; সে মড়ার গলায় বর মালা দিল, শত্রুকে মিত্র বলে, মিত্রকে দ্রোহী বলিয়া নির্ব্বাসিত করে। হায় আর একজন প্রোমিথিউস্ কবে পৃথিবীতে উদয় হইবে।

তাই, মনুষ্য আদর্শ চাহে। বিশ্বপ্রেম আয়ত্ত করিতে আদর্শের আবশ্যক। সকল কার্য্যে সাধনা চাই। বিশ্বপ্রেমের আদর্শে আমি দেবী প্রতিমা স্থাপন করিয়াছি। সে প্রতিমা কবিশ্রেষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠদিগের অনুমোদিত। সেই আদর্শ আমার চপলতা হরণ করিয়াছে, বাচালতা শাসন করিয়াছে, ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছে, স্বর্গের আভাস দিয়াছে, প্রেমের আস্বাদ দিয়াছে, অমৃতের অধিকারী করিয়াছে। ভাই, তুমি সত্যই বলিয়াছ, আমি অমর হইতে চলিয়াছি। যে প্রেম চিনে না সে স্বর্গের অধিকারী নহে। দিল্লীতে যোগমায়ার মন্দির দেখিয়াছিলাম, প্রতিদিন নবকুসুমে মায়ের প্রতিমা গঠিত হয়। আমার প্রতিমা কল্পনাগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়ের অতীত। কুসুমের সৌরভ, চাঁদের আলো, মেঘের গম্ভীরতর উপাদানে গঠিত। ঈশ্বরের অবতার, প্রেমের মূর্ত্তি, সুখের উৎস, বিষাদের আকার জগতের অভূতপূর্ব্ব প্রাণতা। তিনি আমার কেহ নহেন, আমি তাঁহার, তিনি জগতের। যে সাধনা করিবে, সেই তাঁহাকে পাইবে। যোগের পরিণাম, ধ্যানের চিন্তা, ছায়ার স্বপ্ন, উপাসনার ভক্তি, তাঁহারই আমি আর কাহারই নহি, আমি নিজেরও নহি, আমি তাঁহারই। আশীর্ব্বাদ কর, আমার সাধনা সিদ্ধ হয়, আমি প্রেমের অধিকারী হই।

প্রেম বড় না জ্ঞান বড়? এতদিন যৌবনের উদ্দামে, জ্ঞানের নবীনতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বুদ্ধির প্রখরতা, জ্ঞানের চপলতা, জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া বিবেচনা

করিতাম। মস্তিষ্কের চটুলতা উপেক্ষা করিলাম, যে দিন হৃদয়ের গভীরতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; সেই দিন বুঝিয়াছি, জগতের যাবতীয় বিজ্ঞানবিতের জ্ঞান-সমষ্টি প্রেমকণার তুল্য মূল্য নহে। এক জন হৃদয়বান লক্ষজন বুদ্ধিমানের সমকক্ষ। শয়তানের বুদ্ধি কোটী স্পেনসর, ডারবিন, বেস্থাম ও কোমতের অনধিগম্য, সে শয়তান নরকের কীট, মিক্কিটফিলিস্ কাঞ্চন-জঙ্ঘার পাদদেশে, কষ্ট তাহার শিয়রে। তাই জ্ঞানযোগ ছাড়িয়া প্রেমযোগ সর্ব্বস্ব করিয়াছি। বুদ্ধির ভেলা ছাড়িয়া দিয়া প্রেমের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন কুল পাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

পৌত্তলিক কে?

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় ভজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহংহিসর্ব্বয়জ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতুমামভি জানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তিতে॥

এক দিন গভীর রাত্রিকালে একজন চোর কোন এক গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে দেখিতে পাইল, মাচার উপরে ধান আছে। আপনার গায়ের চাদর মাটিতে পাতিয়া মাচায় উঠিয়া তাহার উপরে ধান ঢালিতে লাগিল। ধানের শব্দে গৃহস্থের ঘুম ভাঙ্গিল। গৃহস্থ আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই চাদর খানা লুকাইয়া ফেলিল। ধান ঢালা শেষ হইলে পর, চোর নামিয়া ধান বাঁধিবে বলিয়া চাদরের কোণ তল্লাস করিতে লাগিল; এমন সময় গৃহস্থ তাহাকে ধরিল। দুজনে অনেক ধস্তাধস্তির পর চোর তাহার হাত ছাড়াইয়া বাহিরে আসিল। গৃহস্থ "চোর, চোর," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চোর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই চোর, না আমি চোর? তুই আমার চাদর চুরি করিলি, উলটো চোর হইলাম কি আমি?" পাড়ার লোক জড় হইল। এবলে ওকে চোর, ও বলে একে চোর। সেই চোর যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুই চোর না আমি চোর," আজ আমরাও, পৌত্তলিকের পক্ষ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি পৌত্তলিক না আমরা পৌত্তলিক? আজ এ প্রশ্নেরই মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

বল দেখি পৌত্তলিক কে? (১) যে অজ্ঞতাবশতঃ কোন মূর্ত্তি অথবা অন্য চিহ্নকে ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করে। এই অর্থে, যে ঈশ্বরকে না জানিয়াছে, সে পৌত্তলিক হইতে পারে না; কারণ যে শ্যামকে না জানে, সে রামকে শ্যাম মনে করিতে পারে না। তবে বলিতে পার, সাধারণ ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান মানুষ মাত্রেরই আছে। এবং যাহার যে পরিমাণে প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান লাভ

হইয়াছে, সেই পরিমাণেই সে অন্য বস্তু দেখিয়া ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করিতে পারে। এ কথা সত্য হইত, যদি প্রকৃত ঈশ্বরের সহিত তাহার চিহ্নের কোন সাদৃশ্য থাকিত। নুন, দেখিতে চিনির মতন বলিয়াই বালক কখনও চিনি ভাবিয়া নুন মুখে দেয়। যে পরিমাণে তুমি শ্যামকে জান,সেই পরিমাণেই শ্যামের মত অপর এক ব্যক্তিকে তুমি শ্যাম বলিয়া ভ্রম করিতে পার। যাহার যে পরিমাণে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ হয় নাই, সেই পরিমাণেই সে অন্য বস্তুকে ঈশ্বর মনে করিতে পারে না; 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু তাহার 'ঈশ্বর' পদবাচ্য বস্তু সেই পরিমাণেই প্রকৃত ঈশ্বর নয়। তুমি যাহাকে ইচ্ছা শ্যাম বলিয়া ডাকিতে পার, তাহা বলিয়া যে সেই আমাদের প্রকৃত শ্যাম হইবে না। তাহার 'ঈশ্বর' মনে করা যেমন প্রকৃত ঈশ্বর মনে করা হইল না, তাহার ঈশ্বর পূজাও পান ভোজনাদির ন্যায় ক্রিয়াবিশেষ মাত্র হইল। এস্থলে ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব অথবা সঙ্কীর্ণতাই তাহার দোষ। তাহাই যদি পৌত্তলিকতা হয়,তবে অনাস্তিক মাত্রেই মহা পৌত্তলিক। যাহা হউক, এস্থলে নূতন সংজ্ঞার বিচার না করিয়া, তাহা পরে করাই কর্ত্তব্য।

যে প্রকৃত ঈশ্বরকে জানে, অথবা যে পরিমাণে জানে তাহার পক্ষে আবার চিহ্নকে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করা অসম্ভব, অথবা সেই পরিমাণে অসম্ভব। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার চিহ্নের কি সাদৃশ্য যে একেকে অন্য বলিয়া ভ্রম করিবে? চিহ্ন জড়, পূজা গ্রহণ চেতনের কার্য্য, মূর্ত্তির গুণ—স্থূলতা, ব্যাপ্তি, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। যে কেহ সরল ভাবে দুর্গামূর্ত্তির পূজা করে,তাহার মনের ধারণা থাকে না যে, সেই পূজার পাত্র দুর্গার বেড় এক হাত,লম্বা তিন হাত, মাটিতে নির্ম্মিত। সে যে দুর্গার প্রতি ভক্তি অর্পণ করে,সে দুর্গা তাহার ভক্তি গ্রহণে সমর্থ জানিয়াই অর্পণ করে। অতএব সে দুর্গা জীবন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্‌। সেই মূর্ত্তিতে এবং সেই ভক্তির পাত্রেতে কোন সাদৃশ্য নাই। শুক্তি দেখিয়া লোকে যেমন তাহাতে রজত বলিয়া ভ্রম করে, মূর্ত্তি দেখিয়া লোকের তাহাতে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করিবার সেরূপ কোন কারণ নাই।

অথবা তর্কস্থলে যদি মানা যায়, মূর্ত্তির সহিত ঈশ্বরের সাদৃশ্য আছে, তাহাতেই বা কি হইবে? যদি সেই পূজা গ্রহণে অসমর্থ দুর্গা মূর্ত্তিকে পূজা গ্রহণে সমর্থ দুর্গা বলিয়া ধারণা করিতে হয়, তবে জড়কে অজড়, দেশকাল পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে সর্ব্বব্যাপী, নিশ্চেষ্টকে সর্ব্বশক্তিমান ভাবিতে হয়। কিন্তু একই সময়ে একই বস্তুকে জড়, পূজা গ্রহণে অসমর্থ জানিয়া, আবার তাহাকে অজড়, পূজা গ্রহণে সমর্থ বলিয়া ধারণ করা যায় না। অর্থাৎ মূর্ত্তি মনে করিলে ঈশ্বর মনে করা যায় না, ঈশ্বর মনে করিলে মূর্ত্তি মনে করা যায় না। যদি বল প্রথমে মূর্ত্তি জ্ঞান হইয়া পরে ঈশ্বর জ্ঞান হয়,তবে শ্যামের ছবি দেখিয়া শ্যামকে স্মরণ করার ন্যায়, অথবা বস্ত্রে গ্রন্থি দর্শনে কোন বিশেষ বিষয় স্মরণ হওয়ার ন্যায় তাহাতে দোষ হয় না। দুই জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক। চিহ্নকে ঈশ্বর মনে করা হইল না, চিহ্নের চিহ্নত্ব ভুলিয়াই ঈশ্বর জ্ঞান হইল। চিহ্ন বীজগণিতের অর্থ শূন্য ক, খ, গ এর ন্যায় সাহায্যকারী মাত্র হইল। অথবা লোকে যেমন বলিয়া থাকে, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" মূর্ত্তি জ্ঞান

দ্বারা মন স্থির হইয়া পরে চৈতন্যময় ঈশ্বরে মন সমর্পিত হইল। একের পর অথবা সাহায্যে অন্যের জ্ঞান হইল, কিন্তু এক অন্য হইল না—রাম জ্ঞান হইল না।

তবে পৌত্তলিক কে? (২) যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন চিহ্ন বিশেষ ব্যবহার করে সেই পৌত্তলিক। ইহাতে যদি কেহ পৌত্তলিক হয়, তবে তাহাতে দোষ দেখি না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চিহ্ন অবলম্বন করিয়া যদি কাহারও অতীন্দ্রিয় চিন্ময়াত্মার স্মরণ হয় বলিয়া সে পৌত্তলিক হয়, তবে তুমিও পৌত্তলিক। বাক্য কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়? 'পরমাত্মা' এই শব্দ যেমন পরমাত্মা বস্তুকে বুঝায়, অথচ পরমাত্মা বস্তুর মধ্যে 'প'ও নাই 'র'ও নাই "মাত্মা" ও নাই, সেই রূপ স্থূল মৃণ্ময় মূর্ত্তিও সেই পরমাত্মা বস্তুকে বুঝাইতে পারে, যদিও পরমাত্মাবস্তুর গুণ স্থূলত্বও নয় মূর্ত্তত্বও নয়। 'পরমাত্মা' শব্দেতে এবং স্থূল মূর্ত্তিতে তারতম্য এই যে একটী শাব্দ চিহ্ন আর একটা চাক্ষুষ চিহ্ন, কিন্তু দুইই চিহ্ন। কোন্ দোষে চক্ষুগ্রাহ্য চিহ্ন ব্যবহারে পৌত্তলিকতা হইল, কোন্ গুণে কর্ণগ্রাহ্য চিহ্ন ব্যব-হারে পৌত্তলিকতা হইল না? আমরা যাহা বুঝি ভাবেতে যদি কোন দোষ না থাকে, চিহ্ন ব্যবহারে কোন দোষ হইতে পারে না। চিহ্নের স্বতঃ কোন মূল্য নাই। মৃণ্ময় মহাদেবই বল অথবা বর্ণ গঠিত 'ঈশ্বর' শব্দই বল, অথবা শূন্য আকাশই বল, চিহ্ন রূপে ইহাদের কোন তারতম্য হয় না। ব্রহ্ম দর্শন যদি লাভ করিয়া থাক, তবে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়, তোমার সম্মুখে শিবলিঙ্গই থাকুক, অথবা মুখে ঈশ্বর শব্দই আসুক, অথবা বাহিরে কিছু নাই হউক, তুমি পৌত্তলিক নও। আর যদি পরমাত্মার দর্শন লাভ না করিয়া থাক, তুমি চিহ্ন ব্যবহার কর আর নাই কর, হে সংস্কারক, তুমিই পৌত্তলিক। যদি অপর লোকের ইষ্টানিষ্টের কথা বল, তবে শূন্য আকাশের অথবা 'ঈশ্বর' এই শব্দের স্বতঃ এমন কি গৌরব যে, প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষা অধিক ইষ্ট সাধন করিবে? আবার তুমিও যে উপাসনার সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের চাক্ষুষ চিহ্ন অথবা ছবি ব্যবহার না কর এমন্ত নয়। 'ঈশ্বর' এই শব্দ কাগজে লিখিলেই তাহা চাক্ষুষ চিহ্ন অথবা ছবি হইল। পুস্তক দেখিয়া মনে মনে ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করাকে কেন পৌত্তলিকতা বল না? সে কিছু নয়, ভাবের গৌরবে চিহ্নের গৌরব। চিহ্ন যে রূপই হউক না কেন, তাহাতে বিশেষ ভাবের যোগ হইলে ইষ্ট সাধন করিবেই করিবে। এ সব দিকে দৃষ্টি না করিয়া ভাবের রাজ্যে চলিতে থাক।

চিহ্ন ব্যবহারে যদি পৌত্তলিকতা হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই, একথা বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না, বরং চিহ্ন ব্যবহার করিলেই ধর্ম্ম সাধনা সহজ হয়। শুধু তাহা নয়, কোন কোন চিহ্নের ব্যবহারে জাতি বিশেষের বিশেষ উপকার হয়। খ্রীষ্টানের জর্ডান জলে, হিন্দুর গঙ্গাজলে, পুরুষানুক্রমে বিশেষ পবিত্রভাবের যোগ হইয়া আসি-য়াছে। তাহার সংস্পর্শে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, পৌত্তলিক অপৌত্তলিক সক-লেরই মনে বিশেষ পবিত্রভাবের সঞ্চার হয়। হিন্দু সন্তান মাত্রেরই মনে তুলসিপত্র, গঙ্গাজল, বিল্বপত্র, যবাফুলের যোগে সহজে যে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়, কলের অতি পরিষ্কৃত জলে, অথবা অতি সুগন্ধি সুন্দর

অপরাপর পত্র পুষ্পে সে ভাব হইবে না। সকলে ইহা অনুভব করুন আর না করুন, এ অতি স্বাভাবিক কথা। কালী দুর্গার নাম সম্বন্ধেও সেইরূপ। পুরুষানুক্রমে এমনি পবিত্র ভক্তি ভাবের যোগ হইয়া আসিয়াছে যে, কালী সাধক যখন তাঁহার 'আনন্দময়ী শ্যামা মায়ের' গুণগান করেন, শুনিয়া, পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, ভাবুক মাত্রেরই প্রাণ শীতল হয়। শ্যামা যেন কি মধুময় নাম। পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, সাধক মাত্রেই ইহা অনুভব করিয়া থাকেন।

দুর্গা কালী নাম সম্বন্ধে আরও বলা যায়, শব্দ রত্নের উদ্ধার নিতান্ত প্রয়োজন। যদি একথা সত্যও হয়, দুর্গা কালী নামে ঈশ্বর ভাবের বিরোধী ভাবেরও যোগ হইয়াছে, তাহা বলিয়া সে সকল নাম পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ভাবেরই সংস্কার করিতে হইবে। দুধ-কলসিতে মাছি পড়িলে দুধ শুদ্ধ কলসি কেহ ফেলিয়া দেয় না। ঈশ্বরের এমন কি নাম আছে, যে নামে দেশকালপাত্রের দোষে ঈশ্বর ভাবের বিরুদ্ধ ভাবের যোগ না হইয়াছে।' ঈশ্বর শব্দে বিশেষ ভাবে উমাপতিকে বুঝায়। অনন্ত নরকের যোগে খ্রীষ্টানদিগের গড শব্দও এক প্রতিহিংসাপরায়ণ অতি ভীষণ 'কালভৈরব' বুঝায়। যাঁহারা অকাতরে এ সকল নাম গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারা কালী দুর্গা নাম কেন পরিত্যাগ করিবেন, আমরা বুঝি না। শব্দের ভাব সংস্কারই কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া যদি একটী একটী করিয়া শব্দ পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে ধর্ম্মালাপ বন্ধ করিতে হয়। এরূপ করিয়া ভাবাকম্বলের লোম বাছিলে কি থাকিবে? নামই বল আর বিগ্রহই বল, পরিত্যাগ না করিয়া ভাবের সংস্কার, করাই কর্ত্তব্য, দূষিতভাব পরিত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য প্রকৃত ঈশ্বর ভাবের যোগ করাই কর্ত্তব্য। পাতায় পোকা পড়িয়াছে বলিয়া গাছকে উন্মূলিত করা মূর্খের কার্য্য।

হে সংস্কারক, যদি মনে উদিত হয়, তুমিও দুর্গানাম গঙ্গাজল ব্যবহার করিতে পার। কাহারও তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বরং বিপরীত; যে বস্তু অথবা নামেতেই হউক তুমি প্রকৃত ঈশ্বর ভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইলে, সে নাম সে বস্তু শোধিত হইয়া সকলের নিকটেই প্রকৃত ঈশ্বরের নাম ঈশ্বরের চিহ্ন বলিয়া পরিচিত হইবে। হাড়েতে মজ্জাতে হিন্দুর ভিতরে দুর্গা নামে যে ভক্তি-স্রোত বহিতেছে, সে নামে প্রকৃত ঈশ্বরের ভাব আসিলে অতি সহজে সে স্রোত ঈশ্বরের দিকে বহিতে থাকিবে। অন্য নামে হয়ত সে ভক্তিভাব অনেক আয়াস, অনেক সাধনাতেও তত সহজে আসিবেনা।

গঙ্গাজলাদিতে বিশেষ পবিত্র ভাব অনুভব না করে এরূপ লোকও থাকিতে পারে; তাহাদের মধ্যে সে ভাব যাপ্য অথবা 'লেটেণ্ট' অবস্থায় আছে। পরিহাসচ্ছলে বৃদ্ধেরা এরূপ একটী বালকের কথা আমাদিগকে বলিতেন। একজন ভদ্রলোক ঘরের দরজায় শুইয়া আছেন, তখন তাঁহার শিক্ষাভিমানী পুত্র ঘরে যাইতে বাপের মাথায় তাহার পা লাগিয়াছিল। পুত্র কিছু মনে না করিয়া অনায়াসে চলিয়া গেল। দেখিয়া বাপের ভয়ঙ্কর রাগ হইল। তিনি বালককে গালি দিতে লাগিলেন। বালক উত্তর করিল;—"সে কি? মাথাতে পা লাগা যা, পায়েতে মাথা লাগাও তাই,

ইহাতে রাগ করিবার কি আছে। একটা মাংস পিণ্ডিতে আর একটা মাংসপিণ্ড লাগিল, তাহাতে মান অথবা অপমান মনে করা ভয়ঙ্কর কুসংস্কার। এরূপ বুইও কেথের (অন্ধ বিশ্বাসের) প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত অন্যায়।"

তবে পৌত্তলিকতা কি? (৩) ঈশ্বরের কোন বিশেষ আকার হইতে পারে বিশ্বাস করাই পৌত্তলিকতা। যাহারা মনে করে ঈশ্বরের আকারবিশেষ হইতে পারে, ঈশ্বর সেই আকারেই আবদ্ধ থাকেন, তাহারা এরূপ মনে করে না। যাহারা দশভুজা দুর্গাকে ঈশ্বর বলে, তাহারাই আবার চতুর্ভুজা কালীকেও ঈশ্বর বলিয়া থাকে। তাহারা বাস্তব বিশ্বাস করে, ঈশ্বর, যে আকার ইচ্ছা, সেই আকারই ধারণ করিতে পারেন। এ শক্তি ঈশ্বরেতে নাই বলিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকে না।

পূর্ণ অনন্ত স্বরূপের পক্ষে দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ, বিরুদ্ধ কথা, যদি বল, আমরা জিজ্ঞাসা করি, পূর্ণ অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম বস্তু দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন আকারের আধার হইতে পারেন, কি পারেন না? যদি পারেন না, তবে তাঁহার পক্ষে পরিচ্ছিন্ন আকারবিশিষ্ট জীব সৃষ্টি করাও অসম্ভব হয়। যে জীব সৃষ্টি করিবেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে সে জীবকে চিন্তা করিতে হইবে, ইচ্ছা করিতে হইবে। অতএব চিন্তাতে এবং ইচ্ছাতে তাঁহাকে সেই দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন জীবাকৃতির আধার হইতেই হইবে। যদি বল পারেন, তবে সেই দেশকাল পরিচ্ছিন্ন জীবাকৃতির আধার ব্রহ্ম বস্তু, সেই আকারে অন্যের দর্শনে আসিতে বাধা দেখা যায় না। সামান্য দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, এক জন চিত্রকরের কল্পনাতে যখন একটী চিত্র পূর্ণভাবে উপস্থিত হয়, তাহা কাগজে অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে, সেই চিত্রকর যদি আপনার আত্মার প্রতি দৃষ্টি করে, সে আপনাকে সেই চিত্ররূপেই দেখিতে পাইবে। অথবা স্বপ্নকালে যখন কোন বস্তু আমাদের কল্পনাতে উপস্থিত হয়, তখন আমরা আপনাদিগকে সেই স্বপ্ন-কল্পিত বস্তু রূপেই দেখিতে পাই। গুণকে গুণী হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না। চিত্রকরের কল্পিত চিত্র, অথবা আমাদের স্বপ্ন কল্পিত বস্তু আমাদের আত্মার সেই কালের একটা গুণ অথবা অবস্থাবিশেষ ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। আবার আত্মা অবিভাজ্য, অতএব একথাও বলা যায়না, যে, তাহার অংশ বিশেষ চিত্ররূপে, অথবা স্বপ্নকল্পিত বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই চিত্রকর চিত্ররূপে, এবং আমরা স্বপ্ন-কল্পিত বস্তুরূপে আপনাদিগকে পূর্ণ ভাবেই দেখিতেছি, বলিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন মানুষের নিকটে আবির্ভূত হন, মানুষের আত্মাও যদি পরস্পরের নিকট সেই ভাবে আবির্ভূত হইতে পারিত, তবে সেই সময়ে সেই চিত্রকরের আত্মা চিত্ররূপে এবং আমাদের আত্মা স্বপ্ন-কল্পিত বস্তুরূপেই আবির্ভূত হইত। ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধেও সে কথাই হইবে। সেই জগচ্চিত্রকর দুর্গা কালীরূপে স্বতন্ত্র জীব বিশেষ সৃষ্টি না করিয়া, কেবল দুর্গা কালী মূর্তিমাত্র কল্পনাতে ধারণ করিয়া যদি ভক্তের নিকটে আবির্ভূত হন, ভক্ত তখন তাঁহাকে দুর্গাকালীরূপেই আবির্ভূত দেখিতে পাইবেন।

অথবা সে কথা দূরে যাউক, যদি পূর্ণ অনন্ত স্বরূপের পক্ষে দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ অসম্ভবই হয়, যাহারা তাহা

না বুঝিয়া সরল ভাবে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করে, সে জন্য তাহারা দোষী হইতে পারে না। যদি দোষী হয়, তোমাকেও সে দোষে দোষী বলিতে হয়,—তোমাকেও পৌত্তলিক বলিতে হয়। স্থান সম্বন্ধ থাকিলেই আকার আছে। যাহা এখানে আছে, ওখানে নাই, তাহারই আকার আছে। এখানে ঈশ্বর আছেন, ওখানে তিনি নাই, এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটে না সত্য, কিন্তু যখন আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করি, তখন স্থান সম্বন্ধ যোগেই ধারণা করি ; যেমন 'ঈশ্বর এই ব্রহ্মমন্দিরে আছেন' 'আমার হৃদয়ে আছেন।' 'ব্রহ্মমন্দিরে আছেন' বলিলেই জ্ঞাতার অনুভব সম্বন্ধে ব্রহ্মমন্দিরের বাহিরে নাই বুঝায়। এস্থলে জ্ঞাতার অনুভবে ব্রহ্মমন্দিরের আকারই ঈশ্বরের আকার হইল। ঈশ্বরেতে দুর্গা কালীর মূর্ত্তি আরোপ করাতে যদি পৌত্তলিকতা হয়, ব্রহ্মমন্দিরের আকার আরোপ করিলেও তাহাই হইবে। তবে যদি বল, 'ব্রহ্মমন্দিরে ঈশ্বর আছেন' এ কথা যখন বলা হয়, তখন ঈশ্বরের সেই আকার বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, কিন্তু দুর্গা কালী ঈশ্বর যাহারা বলে, তাহারা ঈশ্বরের সেই আকারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করে। একথাও ঠিক হয় না। লোকে দুর্গা কালীর পূজা কেন করে ? এই বলিয়া নয় যে, তাহার একটা বিশেষ আকার আছে, তাহা মাটীর দ্বারা নির্ম্মিত ; এই বলিয়া নয় যে, ইহা তিন হাত উচ্চ অথবা ইহার দশটা হাত আছে। অসংখ্য অপরাপর মূর্ত্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেন সেই বিশেষ মূর্ত্তির পূজা করে ? এই বলিয়াই করে যে, উপাসক অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন বস্তু আছে, যে তাহার বাসনা পূর্ণ করিতে পারে। এই বলিয়াই করে যে, তাহার মধ্যে ঐশী শক্তি সকল আছে। ঐশী শক্তিতেই উপাসকের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। যে যে মূর্ত্তিরই পূজা করুক, মূর্ত্তির পূজা কেহ করে না, ঐশী শক্তিরই পূজা করে,—ঈশ্বরেরই পূজা করে।

অথবা তোমার কথাই যদি সত্য মানা যায়, যদি আকারেই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে—তদ্দারা তাহাদের ঈশ্বর সাধনার বাধা হয়, এমন মনে করা যাইতে পারে না। তাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে যথাশক্তি ঈশ্বর জানিয়াই দুর্গা কালীর পূজা করে, সে পূজা ঈশ্বর অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। যদি তুমি লাট সাহেবকে উপহার দিতে যাইয়া, না চিনিয়া তাঁহার বাড়ীর এক জন চাকরকে সে উপহার দিয়া আস, তুমি সে ভ্রম ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলে না। লাট সাহেব যদি জানিতে পান যে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপহার দেওয়া হইয়াছে, তিনি অবশ্যই তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। তবে কেন মনে করিব, ঈশ্বর সেরূপ করিবেন না ?—দয়া করিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না ? আমরা আরম্ভে গীতা হইতে যে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, সে অতি সত্য কথা। যে দেবতা অথবা জড় বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়া তুমি পূজা কর, ঈশ্বর দয়া করিয়া অবশ্যই তোমার সে পূজা স্বয়ং গ্রহণ করিবেন, কালে তোমার নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

তবে পৌত্তলিকতা কি ? (৪) সৃষ্ট কোন জীব বিশেষকে ঈশ্বর মনে করাই পৌত্তলিকতা। এ কথাও প্রথম কথার ন্যায় বিরুদ্ধ। জীব সৃষ্ট, ঈশ্বর সৃষ্ট নয় ;

জীব অন্তবং—ঈশ্বর অনন্ত, জীব অল্প-শক্তি—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি। জীবকে ঈশ্বর মনে করাও "অশিরস্ক শিরব্যথার" ন্যায় বিরুদ্ধ। জীবজ্ঞান যাহার আছে, সে জানিয়া শুনিয়া জীবকে জীব ভিন্ন আর কি ভাবিতে পারে? যাহার ঈশ্বর জ্ঞান আছে, সেও ঈশ্বরকে ঈশ্বর ভিন্ন আর কি ভাবিবে? রামকে রাম বলিয়া চিনিয়া, কি কেহ আর তাহাকে শ্যাম বলিয়া ভাবিতে পারে? হয় সে ঈশ্বরকে জানে, না হয় সে জানে না। যদি বল জানে, তবে সে ঈশ্বরকে জীব অথবা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবিতে পারে না। যদি বল জানে না, তবে সে সৃষ্ট কোন জীবকেও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারে না; যে যাহা জানে না, সে আবার তাহা মনে করিবে কিরূপে? তবে বলিতে পার, মনুষ্যমাত্রেই আংশিকরূপে ঈশ্বরকে জানে। তাহারও উত্তর এই, যতটুকু জানে, ততটুকু জীবকে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরকে জীব বলিয়া ভাবিতে পারে না। আর যতটুকু না জানে ততটুকুও ভাবিতে পারে না, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

তবে পৌত্তলিকতা কি? (৫) ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব অথবা সংকীর্ণতাই পৌত্তলিকতা। তবে নাস্তিকই পৌত্তলিক অথবা তুমি আমি সকলেই পৌত্তলিক। চিন্তাতে এবং বাক্যে তুমি আমি সকলেই ঈশ্বরেতে স্থানসম্বন্ধ আরোপ করিয়া থাকি। মানুষ-ভাব ও অল্প বা অধিক পরিমাণে, তুমি আমি সকলেই ঈশ্বরেতে আরোপ করি। কোন চিহ্নিত সময়ে ঘটনাতে অথবা ব্যক্তিতে যখন ঈশ্বরের বিশেষ দয়া অনুভব করি, তখন আমাদের অনুভবে, অন্য ঘটনা অন্য সময় অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে ঈশ্বরেতে সেই বিশেষ দয়ার অভাব বুঝায়। অতএব তোমার আমার সকলেরই অনুভাবে, মানুষের মত, ঈশ্বর কখনও বা বিশেষ দয়া করিয়া থাকেন কখনও বা করেন না; পাপে তাপে লাঞ্ছিত হইয়া, সেই পৌত্তলিক সাধকের মতন, তুমি আমি সকলেই হয়ত কখনও ঈশ্বরকে বলিয়াছি, "তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেউ নই।" ঈশ্বর সম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান পূর্ণ হইতে পারে না। তবে যে তুলনা করিয়া এক জনকে আর এক জন পৌত্তলিক বলিবে সেও তত সঙ্গত নয়। তোমার ঈশ্বর জ্ঞানের তুলনায় আমার ঈশ্বর জ্ঞান সংকীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া যদি আমি পৌত্তলিক হই—তবে হয়ত পৌত্তলিকদের মধ্যেও কত রামপ্রসাদ, রামদুলাল জন্মিয়াছে, যাঁহাদের তুলনায় তোমার ঈশ্বর জ্ঞানও সংকীর্ণ; তুমিও তবে পৌত্তলিক।

কিন্তু আমরা যে পৌত্তলিকতার কথা আলোচনা করিলাম, তাহাতে কোন ধর্ম্ম বিশেষের কিছু আসে যায় না। ইহা দ্বারা এই মাত্র হইল, ভক্তিভাবে যাহার যে চিহ্ন ঈশ্বরের বলিতে ভাল লাগে, সে তাহাই ব্যবহার করিবে। পূর্ব্বাভ্যাস অথবা শিক্ষাবশতঃ যাহার যে চিহ্নে ঈশ্বরভাব হইতেছে, শব্দই বল, আর প্রস্তর খণ্ডই বল, অথবা শূন্য আকাশই বল, তাহাকে সেই চিহ্নই ব্যবহার করিতে দাও, তাহাতেই আশু ফল লাভ হইবে।

"জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান
ভোজের বাজি।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই
তুমি হও মা রাজি॥"

মঘেবলে করতরা, লাড় বলে ফিরিঙ্গি বারা।
আল্লা বলে ডাকে তোমার মোগল পাঠান
ছৈয়দ কাজি॥"
রামদুলাল।

চিহ্ন কাড়িয়া লইয়া পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন মূঢ়ের কার্য্য। প্রস্তর কাড়িয়া লইতে পার, জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু আকাশ চিহ্ন কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না; কল্পনার গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। সকল লইয়া গেলেও আকাশ চিহ্ন অবলম্বন করিয়া কল্পনা খেলিতে থাকিবে, পৌত্তলিকতার বিষদন্ত পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যাইবে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেই—মাত্র পৌত্তলিকতার সমূল উচ্ছেদ হয়; তখন চিহ্ন ব্যবহার করা না করা তুল্য হয়, সেই জ্ঞান, শব্দই বল, আর মূর্ত্তিই বল, কোন চিহ্ন অবলম্বন করিয়া লাভ করাই সুবিধা। "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" খ্রীষ্টানদের মত মনে করিও না, মাটীর মূর্ত্তি ব্যবহারে ঈশ্বরের অবমাননা হয়, এ নিতান্ত অসার কথা। বরং ঈশ্বর অবমানিত হইতে পারেন—এ কথা ভাবিলে তাঁহার অবমাননা হয়। যিনি পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ, তাঁহার আবার অবমাননা কি? যে মাটীর মূর্ত্তি ব্যবহার করিল, অবমাননার ইচ্ছা তাহার কল্পনাতেও আসিল না, যাঁহার চিহ্নরূপে সে মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইল, তিনিও অবমাননা রূপে গ্রহণ করিলেন না; তুমি রাস্তার লোক দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছ—"ঈশ্বরের অবমাননা হইল!!" উপাসনার উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা হইত, তবে বলিতে পারিতে একপ্রকারের উপাসনাতে তিনি তুষ্ট হন, আর এক প্রকারের উপাসনায় রুষ্ট হন। ঈশ্বর নির্ব্বিকার স্বরূপ, তুমি আমি উপাসনা করি আর না করি, বেদীতে বসিয়া বক্তৃতায় তাঁহার স্বরূপ বর্ণনাই করি, অথবা চাউল কলা দিয়া, ভোগ সাজাইয়া দুর্গা পূজা করি, তাহাতে ঈশ্বরের সুখ বাড়েও না, কমেও না। উপাসকের মনের তৃপ্তিই উপাসনার উদ্দেশ্য। চাউল কলা দিয়া যাহার তৃপ্তির হয়, তাহার চাউল কলাই দেওয়া কর্ত্তব্য, বক্তৃতায় স্বরূপ বর্ণনা করায় যাঁহার তৃপ্তি হয়, তাঁহার তাহাই করা কর্ত্তব্য।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন ধর্ম্ম বিশেষের কিছু আসে যায় না; কেবল এই মাত্র হইল যে, চিহ্ন লইয়া গোলযোগ করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভে, শাব্দ চিহ্ন যাহারা ব্যবহার করে, তাহারা যেমন অধিকারী, মূর্ত্ত-চিহ্ন যাহারা ব্যবহার করে তাহারাও সেইরূপই অধিকারী। একদিকে যেমন শাব্দ-চিহ্ন-ধারীরা মূর্ত্ত-চিহ্নধারীদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া দোষী করে, আর একদিকে মূর্ত্ত-চিহ্ন-ধারীরাও শাব্দ চিহ্নধারীর নিন্দা করিয়া থাকে। তাহাও নিতান্ত অসার। অভ্যাস অথবা শিক্ষা বশতঃ যদি কাহারও মূর্ত্ত চিহ্নে মন না মিশে, তাহাকে সে চিহ্ন ব্যবহার করিতে বলা আর তাহাকে কপট ব্যবহার করিতে অথবা চুরি করিতে বলা, একই কথা। তাহাকে সে জন্য তাড়না করা, সমাজচ্যুত করা, নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। "যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং, চৌরনাত্মাপহারিনা।" মূর্ত্তচিহ্নধারী শাব্দধারীকে অথবা শাব্দ চিহ্নধারী মূর্ত্তধারীকে ঘৃণা করিবেনা, অথবা পর বলিয়া ভাবিবে না।

তাহাদের মধ্যে কিছু মাত্র বিরোধ নাই, উভয়ই একই ভগবানের দাস। দাসকে তাড়না করা আর প্রভুকে অবমাননা করা, এক কথা। যদি এক জনের দেবতা শব্দ হইত, আর এক জনের দেবতা মূর্ত্তি হইত, তবে তাহাদের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহা নয়, উভয়েই একই ঐশীশক্তির পূজক। উভয়েই এক ভূমির উপর দণ্ডায়মান; সদ্ভাব আত্মীয়তা থাকাই কর্ত্তব্য। বিরোধ রাখিতে হইলে তাহাদের উভয়েরই মিলিতভাবে কপটতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য। কপটী (তাহাদেরই দল আজ কাল বড় পুষ্ট) শাব্দ-চিহ্নই ব্যবহার করুক আর মূর্ত্ত-চিহ্নই ব্যবহার করুক, সে ধর্ম্মের শত্রু—জগতের শত্রু। ভণ্ডতা চির দিনই ঘৃণার্হ।

প্রকৃত পৌত্তলিকতা কি,যদি জানিতে চাও, তবে শোন। লোকের খাতিরে, উৎপীড়নের ভয়ে আবার পশারের লোভে, বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করাই পৌত্তলিকতা; কপটতাই পৌত্তলিকতা, সে পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিক অপৌত্তলিক সকলের মধ্যেই আছে। ভণ্ড কিসে পৌত্তলিক? ভণ্ড পৌত্তলিক যেহেতু ভণ্ড শাব্দ অথবা মূর্ত্ত পুত্তলের লক্ষ্য দেবতাকে উদ্দেশ না করিয়া কার্য্য করে। সে তাহার পূজিত পুত্তলকে জীবন্ত ঈশ্বরের চিহ্ন মনে না করিয়া সম্ভ্রম বিলাস অথবা পয়সারই চিহ্ন মনে করে; সেই পুত্তল অবলম্বন করিয়া, ভণ্ড,ঈশ্বরের নামে, তাহাদেরই সেবাপূজা করিয়া থাকে। তাহারই দেবতা প্রকৃত পক্ষে জড় পুত্তল, অতএব সেই প্রকৃত পৌত্তলিক। অথবা প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন যাহার লাভ হয় নাই, সেই পৌত্তলিক। সে অর্থে হয়ত তুমিও পৌত্তলিক, আমিও পৌত্তলিক; তোমার আমার পরস্পরকে পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিতে হইলে স্থান সম্বন্ধযোগে ধারণা করিতে হয়; অর্থাৎ আকার বিশেষের দিকে লক্ষ্য থাকুক আর না থাকুক, তাঁহাকে সাকার বলিয়াই মানুষের ধারণা করিতে হয়। এ কথা অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ শিব বিষ্ণু ইত্যাদি মূর্ত্তি ব্যবহার করিতে সকলকেই বাধ্য করিতে চান। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যদি ঈশ্বরকে সাকারই ভাবিতে হইল, তবে ব্রহ্মাবিষ্ণুরূপে ভাবিতে হানি কি? এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক; যখন ঈশ্বরকে ভাবি তখন লক্ষ্য কি ঈশ্বর, না তাঁহার আকার বিশেষ? যদি ঈশ্বর লক্ষ্য হয়, আমরা ঈশ্বরকেই ভাবিব। ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে যে আকারই আসুক না কেন, তাহাকে টানিয়া শিব-বিষ্ণু করিবার প্রয়োজন কি? যে তাহা না করিবে তাহারই বা অপরাধ কি? স্বয়ং আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক কাল্পনিক শিববিষ্ণু রূপ ঈশ্বরের স্রষ্টা হই কেন? যদি এরূপ হইত, ঈশ্বর ভাবিতে গেলেই শিব বিষ্ণুর মূর্ত্তি ভিন্ন তাঁহাকে ভাবা যায় না, তবে না হয় আমি তাহাতে হানি না দেখিলাম। কিন্তু হয়ত আমি ঈশ্বরকে আকাশ রূপে দেখিলাম, অথবা জগতের সমস্ত বস্তুরূপে দেখিলাম, এখন সেই স্বাভাবিক সহজভাব ফেলিয়া দিয়া বহু আয়াসে তাহাকে ৪।৫ টা মাথারূপে গড়িয়া, এক ব্রহ্মা বা শিবরূপে পরিণত করি কেন? যে আকার অপরিহার্য্য, লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিয়া

ঈশ্বর ধারণা করিতে পারিব না। আবার যে আকারে ঈশ্বর আমার নিকট প্রকাশিত না হইলেন, আমি যদি লাভ ক্ষতি হিসাব করিয়া তাঁহাকে সেই আকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে কি নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য হয় না? এই মাত্রই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, লক্ষ্য না করিয়াও, ঈশ্বরকে ধারণা করিতে গেলে একটা আকার আসে। তাহা ধরিয়া তুমি বলিতেছ "লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ঈশ্বরেতে আমার পূর্ব্ব কল্পিত একটা আকার আরোপ করা"। মূল কথা এই, ঈশ্বর দর্শনকালে শিব বিষ্ণুর মূর্ত্তি পরিহার করা যায় কি পরিহার করা যায় না? যদি পরিহার করা যায়, তবে তোমার দৃষ্টান্ত হানি হইল। কারণ ঈশ্বর ধারণাতে আকার অপরিহার্য্য, এই তোমার হেতু। অপর পক্ষে, যদি পরিহার করা না যায়, তবে তোমার বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। যেই ঈশ্বর ধারণা করিতে যাইবে, সেই তুমি না বলিলেও শিব বিষ্ণুরূপেই ধারণা করিবে, বলিলেও তাহাই করিবে।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চিৎকার নূতন নয়, তবে আজ কাল যে চীৎকার হইতেছে, সে খ্রীষ্টানির অনুকরণ মাত্র। খ্রীষ্টানদিগের গুরু ইহুদি জাতি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রথম চীৎকার তোলে। পরে তাহাদেরই 'গোলে হরিবোল' দিয়া খ্রীষ্টান এবং মুসলমান সে চীৎকার গ্রহণ করে। অধুনাতন শিক্ষিত লোকেরা আবার নিজে চিন্তা না করিয়া এসম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগেরই পাদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের সকলেরই ধর্ম্ম কর্ম্ম আলোচনা করিলে বুঝা যায়, সে চীৎকার কতদূর অসার। ইহুদি জাতি তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর জাতি সকলকে পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিত, উৎপীড়ন করিত। কিন্তু তাহারা নিজেরাও ঘোর পৌত্তলিক ছিল। তাহাদের 'জায়ন' পর্ব্বতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয় একটী মন্দির ছিল, যেখানে 'স্কিকাইনা' নামে, মেঘচ্ছবির আড়ালে ঈশ্বরের এক খানি প্রতিমূর্ত্তি থাকিত, তাহাই ঈশ্বর বলিয়া সকলে পূজা করিত। খ্রীষ্টানেরা ইহুদিদিগেরই ধর্ম্ম সন্তান, তাহারাও নিজে ঘোর পৌত্তলিক। রোম্যান ক্যাথলিকদিগের ত কথাই নাই, প্রোটেষ্টান্টরাও খ্রীষ্টের রক্তমাংস বলিয়া কিছু মদরুটি খাইয়া আপনাদিগকে স্বর্গ লাভে অধিকারী মনে করে। মুসলমানদেরও সেই দশা; তাহাদের মক্কা সরিফে 'কাবা' নামক প্রস্তরখণ্ডে ঈশ্বর সর্ব্বদা আবির্ভূত। না জানিয়া ইহাদেরই ধাঁধায় পড়িয়া অধুনাতন শিক্ষিত লোকেরাও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক রোল তুলিয়াছিলেন; কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গৈরিক বসন্ মৃগচর্ম্ম ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিতেছেন। এসব কথা ভাবিলে, সহজেই লোকের মনে হয়, পৌত্তলিকতা নামেতেই দূষ্য এমন একটা কিছুই নাই; সে কেবল দলাদলির মূলমন্ত্র মাত্র। সার কথা এই, সরল বিশ্বাসে চালিত হইয়া যে যাহা করে, তাহাতেই তাহার ধর্ম্ম সাধনা হয়।

উপসংহারকালে আমরা আবার বলিতেছি, যাহা বলিলাম, তাহাতে কোন ধর্ম্ম বিশেষের কিছু আসে যায় না। পৌত্তলিকতাতে স্বতঃ কোন দোষ নাই, কিন্তু তাহাতে কপটতার যোগ হইলেই দোষ।

য়। যাহাদের দুর্গা কালীর মূর্ত্তিতে ঈশ্বর ার আসে না, অথচ লোকের খাতিরে, ংপীড়নের ভয়ে, মদ্য মাংস অথবা পশা- ার লোভে, খবরের কাগজ হইলে গ্রাহক ুটাইবার আশায়, বাহিরে ভান করিয়া াকেন, যেন ঈশ্বরতায় আসিয়াছে, তাহা দের কপট পৌত্তলিকতা নিতান্ত ঘৃণার্হ। আবার পৌত্তলিকতাতে স্বতঃ কোন দোষ না থাকিলেও আমাদের দেশে যে পৌত্ত- লিকতা প্রচলিত আছে, জাতিভেদের যোগ থাকাতে তাহাতেও দোষ দোগ হইয়াছে। মূর্খ দুশ্চরিত্রলোক যখন তুচ্ছ জন্মের বলে লোক সমাজে ঐশ্বরিক ক্রিয়া কলাপে অধিকার লাভ করে, আর জ্ঞানী সাধু সচ্চ- রিত্র মহাত্মা কেবল জন্মের বাধায় অথবা আহারীয়ের ভেদে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হন, তখন তাহার বিরুদ্ধে শতকণ্ঠে চীৎকার করা কর্ত্তব্য। ভগবান শঙ্করাচার্য্যকে, তাঁহার মাতার মৃতদেহ সংস্কার কালে, ইহা- রই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ইহারই মস্তকে পদাঘাত করিয়া যবনভক্ত হরিদাসের সহিত একত্রে পংক্তি ভোজন করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মও এ সকলেরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন। সত্য তাঁহার সহায়, বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ তাঁহার পথ প্রদর্শক, তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে এমন কে আছে?

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

হিম নদীর উৎপত্তি ও গতি।

(এখানে বলা আবশ্যক যে, ঘটনাক্রমে লেখকের অজ্ঞাতসারে পূর্ব্ব প্রবন্ধের শিরো- নাম "হিমনদী" না হইয়া তুষার প্রবাহ লিখিত হইয়াছিল। তুষার শব্দটা এস্থলে snow অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, হওয়াও উচিত। নতুবা কথার বড় গোলযোগ হইয়া থাকে। এজন্য glacier কে হিম নদী নামেই ডাকা সঙ্গত। আশা করি পাঠক মহাশয়- গণ উদারতা সহকারে আমাদের গত প্রব- ন্ধের প্রকাশে অনবধানতা ক্ষমা করিবেন।)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, হিমনদী তুষার প্রান্তর (snow field) হইতে উৎপন্ন। এক্ষণ ইহার উৎপত্তি-প্রণালী বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্যরশ্মি দুই জাতীয়; জ্যোতি ও উত্তাপ; এই উভয় জাতীয় রশ্মি একত্র হইয়া রৌদ্র হয়। রৌদ্রের আলোক- প্রদ অংশ (light rays) বায়ুতে প্রতি- ফলিত হইয়া এবং পৃথিবীতে পড়িয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করে। এবং উহার তেজ বা উত্তাপপ্রদ রশ্মি (Heat rays or black rays) বায়ুর মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবীতলস্থ পদার্থ সকলকে উত্তপ্ত করিয়া তুলে। বায়ু কিন্তু এই উত্তাপপ্রদ রশ্মিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, বায়ু উত্তাপপ্রদ রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ বা transparent, এজন্য বায়ুর মধ্য দিয়া ধরাপৃষ্ঠে পঁহুছিবার সময় সূর্য্য রশ্মি বায়ু মণ্ডলকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। সূর্য্য- কিরণে বায়ু তখনই গরম হয়, যখন বায়ু সূর্য্য কিরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তপ্ত কোন ধরা পৃষ্ঠস্থ পদার্থের গায়ে লাগে। স্পর্শগত (con- ducted) উত্তাপ ভিন্ন ব্যাপ্তিগত (radiated)

উত্তাপ গ্রহণ করিবার শক্তি বায়ুর নাই বলিলেই হয়। এজন্য পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থ বায়ু উত্তপ্ত ধরাতল ও তদুপরিস্থ পদার্থ সমূহের স্পর্শে যত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, ঊর্দ্ধ দেশস্থিত বায়ু রাশি তাহা না পাইয়া তত উত্তপ্ত হইতে পারে না। এই কারণে যতই উপরে উঠা যায়, ততই বায়ু শীতল বোধ হয়। অধিক ঊর্দ্ধে পর্ব্বতাদির উপরের বায়ু এত শীতল যে, সেখানে জল লইয়া গেলে একেবারে জমিয়া বরফ হইয়া যায়। যাঁহারা ব্যোমযানে আরোহণ করেন, শীতল বায়ু প্রভাবে তাঁহাদের হস্ত পদ অবশ হইয়া যায়, এবং তাঁহারা থারমমিটারের সাহায্যে গণনা করিয়াছেন যে, উপরের বায়ু বরফ জমিবার অপেক্ষাও অধিক শীতল। যাঁহারা দার্জ্জিলিঙ বা সিমলায় গিয়াছেন, তাঁহাদের একথা আর অধিক বাক্যব্যয়ে বুঝাইতে হইবে না।

এই সকল উচ্চ পর্ব্বত শিখরে যখন মেঘমালা বায়ু তাড়িত হইয়া উপস্থিত হয়, তখন আর তত্রত্য প্রচণ্ড শীতে তাহাদের সূক্ষ্ম জলীয় কণা সমূহ তদবস্থায় থাকিতে পারে না। পর্ব্বত শিখরের বা তন্নিম্নস্থ শীতল অধিত্যকার স্পর্শ মাত্র মেঘের জলকণা সকল, সূক্ষ্ম বরফ কণায় পরিণত হয়। এই বরফ কণার নাম তুষার বা Snow। পর্ব্বতোপরিস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রান্তরগুলি এইরূপে তুষার কণায় মণ্ডিত হয়। প্রতি বৎসর সময় বিশেষে ভূরি ভূরি মেঘ আসিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে আঘাত করে এবং ঘোর শৈত্যময় শিলা স্পর্শমাত্র তুষার স্তূপে পরিণত হইয়া পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করে। ইহারই শোভায় হিমালয় চিরদিন দর্শক মাত্রেরই নয়ন-লোভনীয়। হিমাদ্রির বিমল শুভ্রশির—ধবলগিরি, দূর হইতে যাঁহারা একটী বার দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর ক নই সে মনোহর দৃশ্য বিস্মৃত হইবেন না।

কিন্তু বৎসরের এক সময়ে যেমন মে আসিয়া তুষার উৎপাদন করে, আর এ সময়ে আবার সূর্য্যকিরণে উহা দ্রবী ভূত হইয়া যায়; তবে "চিরতুহিন মণ্ডিত পর্ব্বতমালা" কিরূপে হয়?—উত্তর অতি সহজ। যতই উপরে যাইব, ততই শীতের আতিশয্য অধিক। এজন্য যে স্থান যত উপরে, সে স্থানে তুষার তত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এবং সেই কারণেই যে স্থান যত উচ্চ সে স্থানের তুষার, সূর্য্যকিরণ ক্ষীণ বলিয়া, তত অল্প পরিমাণে দ্রব হয়। কাজেই অতি সহজেই দেখা যাইতেছে যে, যে স্থান যত উচ্চে অবস্থিত সে স্থানে তত অধিক পরিমাণে তুষার উৎপন্ন হয়, কাজেই সেই সকল স্থানে প্রতিবৎসরই বিস্তর তুষার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সমস্ত বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণে তুষার পতিত হয়, তাহা অপেক্ষা সমস্ত বৎসরের দ্রবীভূত তুষারের পরিমাণ খুব অল্প, সুতরাং প্রতি বৎসরই বিস্তর তুষার অবশিষ্ট থাকে। আবার সেই অবশিষ্ট তুষার রাশির উপর নূতন বৎসরের নূতন তুষার রক্ষিত হইতে থাকে।

এই গেল উপরের কথা। কিন্তু যে স্থান তত উচ্চে অবস্থিত নহে, তথায় ক্রমশ দ্রবীভূত তুষারের পরিমাণ বাড়িতে থাকে ও সঞ্চিত তুষারের পরিমাণ কমিতে থাকে; কেন না যে স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ উপর অপেক্ষা অধিক। অথবা ইহাই বলা সঙ্গত যে, তথাকার বায়ু ধরাতলের উত্তপ্ত বায়ুর নিকটে অবস্থিত হওয়ায়, উপরের বায়ু অপেক্ষা অধিকতর উত্তাপবিশিষ্ট। এইরূপে

নামিতে নামিতে শেষে পর্ব্বত পার্শ্বের এমন এক স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, যেখানে সম্বৎসরের সঞ্চিত তুষার গ্রীষ্মকালে ঠিক গলিয়া যায়। এখানে যেমন আয়, তেমনি ব্যয়। কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই স্থানের একটী বিশেষ নাম আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এই সীমাবর্ত্তী রেখাকে snowline বা "তুষার রেখা" কহেন। ইহার নিম্নেও তুষার পাত হয় বটে, কিন্তু সে তুষারের কিছুই সঞ্চিত হইতে পায় না, সুতরাং তুষার প্রান্তরের সংগঠনে তুষার রেখার নিম্নস্থ স্থান সকলের কোন অধিকার নাই। এই তুষার রেখার উচ্চতা, সকল পর্ব্বতে সমান নহে। পর্ব্বতের অবস্থান ভেদে, উহারও উচ্চতা ভেদ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে তুষার রেখা অনেক উচ্চে অবস্থিত। আবার শীত প্রধান দেশে উহার উচ্চতা নিতান্ত কম। হিমালয়ের উত্তর ভাগের তুষার রেখার উচ্চতা অন্যূন ১৬,৬০০ ফিট। আমেরিকার পেরু দেশস্থ আণ্ডিস্ পর্ব্বতে ইহার উচ্চতা ১৫,৫০ ফিটের কম নহে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শীতল দেশে, যেমন সুইৎজর্লাণ্ডের আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতে, এই রেখার উচ্চতা ৮,৫০০ ফিট মাত্র। আবার গ্রীন্‌লণ্ড প্রভৃতি উত্তর প্রদেশে এই রেখা সাগরপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে, সেই জন্য ঐ সকল স্থানে হিমনদী সমূহ সাগরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়।

তুষার প্রান্তর সকল এই তুষার রেখার উপরিভাগে উচ্চ অধিত্যকায় দেখা যায়। এখানে প্রতি বৎসরই প্রচুর তুষার স্তূপাকার হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। এখন প্রশ্ন এই যে, এক একটী পর্ব্বত যে কত কাল হইতে বর্ত্তমান আছে তাহার ঠিক নাই, তবে প্রতি বৎসর যদি এইরূপে তাহাদের উপর তুষার স্তূপ সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে এত দিনে হয়ত কত শত ক্রোশ উচ্চ হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহাত হয় না। তবে ঐ বাৎসরিক তুষার বৃদ্ধির গতি কি হয়? প্রতি বৎসর যে নূতন নূতন তুষার স্তূপ পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তাহারা হয় কি? যায় কোথায়?

চিন্তাশীল পাঠক হয়ত বলিবেন "কেন? কিয়দংশ গলিয়া জল হইয়া যায়, অবশিষ্ট পুনঃ কনেকটা হয়ত একেবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।" যদি কেহ সে সকল দেশে গিয়া থাকেন তবে তিনি হয়ত হাসিয়া বলিবেন "কেন? আমি যে দেখিয়াছি মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রকাণ্ড পর্ব্বতপুঞ্জের মত তুষারপিণ্ড নিজভারে ও বায়ুর আঘাতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাদের দ্বারা ঐ তুষার রাশির নিশ্চয়ই অনেক হ্রাস হয়।" সত্য সত্যই সমস্ত তুষাররাশি কিয়ৎ পরিমাণে সূর্য্য কিরণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পরিমাণ এতই অল্প যে, তদ্দ্বারা ঐ পর্ব্বতোপম স্তূপের কিছুই করিতে পারে না। ইহাও সত্য যে, মধ্যে মধ্যে আভালাশ বা প্রকাণ্ড তুষার পিণ্ড সকল বায়ুতে উড়িয়া পড়ে ও নিম্নস্থ গ্রাম নগরাদির বিস্তর অনিষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু সে দিগন্তব্যাপী তুষার প্রান্তরের তুলনায় এরূপ সহস্র আভালাঁশ ও নগণ্য। তবে কি উপায়ে ঐ তুষার ব্যয়িত হয়? উপায় দুইটী।

প্রথমত—উপরিস্থ স্তূপের বিপুলভারে চাপ পাইয়া নিম্নস্থ তুষাররাশি সঙ্কুচিত হইয়া, ক্রমে অল্প হইতে অল্পতর স্থান অধি-

কার করিতে থাকে। যাঁহারা তুষার কণা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে উহা নিরেট নয়। প্রত্যেক কণা তুলার কণার মত হালকা, (ভিতরে বায়ু থাকাতে শুভ্রবর্ণ দেখায়) ছটী পাপড়ীবিশিষ্ট ছোট ছোট ফুলের মত দানা বাঁধা Crystals। কাজেই চাপ পাইলে এই পাপড়ীর মত বাঁধা দানা ভাঙ্গিয়া যায়, ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া যায় এবং গুঁড়া গুঁড়া তুষার জমাট বাঁধিয়া চাপ চাপ বরফ হইয়া যায়। উপর কার তুষার-গলা জলও ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইহাতে সাহায্য করে। কাজেই আগে যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া ছিল, এখন তদপেক্ষা অনেক কম স্থানেই তাহাদের সমাবেশ হয়। এইরূপ যতই অধিক তুষার জমিতে থাকে, ততই নীচের তুষারের আল্‌গা ভাব ঘুচিয়া গিয়া উহা ঘন হইয়া জমাট্ বরফ হইয়া দাঁড়ায়, ফলে এই হয় যে, রাশি রাশি তুষার জমিয়া অল্প স্থানেই বরফ (ice) হইয়া থাকিতে পায়, কিন্তু ইহাতেও কি যথেষ্ট হয়? সৃষ্টির আদিকাল হইতে যদি এইরূপে উপরে তুষার ও নীচে বরফ সাজান হইয়া আসিতে থাকে, তাহা হইলেও এত দিনে প্রত্যেক পর্ব্বতের মস্তকে কত গুণ উচ্চ বরফের চূড়া নির্ম্মিত হইত! তবে আরও কারণ আছে।—সে কারণ কি?

দ্বিতীয়ত—পর্ব্বত পৃষ্ঠের সাধারণ ঢালু ভাব বশত, এবং উপরিস্থ তুষার স্তূপের বিপুল ভারে আক্রান্ত হইয়া, উক্ত নিম্নতলস্থ বরফস্তর ক্রমশ পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া নিম্নে আসিবার চেষ্টা করে। কাজেই সে অবস্থায় ঐ বরফকে স্বস্থানে রাখিবার জন্য কোন উপায়ই থাকেনা। নীচের বরফ ধীরে ধীরে নামিতে থাকে। উপরে যেমন তুষার তেমনই থাকে, কিন্তু নিম্নতলস্থ জমাট তুষার অর্থাৎ বরফ, ক্রমে ক্রমে উপর হইতে চাপ পাওয়ায় এবং নিম্ন ঢালু প্রদেশে স্থির থাকা অসম্ভব হওয়ায় অগত্যা নীচের দিকে নামিতে থাকে। তুষার প্রান্তরের যে ভাগ অপেক্ষাকৃত নিম্ন, সেই ভাগ দিয়া প্রথমে বরফ পতিত হইতে আরম্ভ হয়, ক্রমে পর্ব্বতের যেখানে নিম্নগলি বা সংকীর্ণ উপত্যকার মত স্থান প্রাপ্ত হয়, উক্ত অতিরিক্ত বরফরাশি সেই স্থান দিয়াই নামিতে থাকে। অবশেষে যখন খুব নিম্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে আর বরফ দ্রব না হইয়া থাকিতে পারে না, তখন ক্রমে গলিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু অত্যন্ত গভীর বলিয়া গলিতে গলিতেও অনেক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। এজন্য তুষার রেখার অনেক নীচে পর্য্যন্তও হিম নদী সকল দেখা যায়। ইউরোপে হিমনদী এই অবস্থাভেদ লইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তথায় তুষার রেখার উপরিস্থ অংশকে "নেভে" Névé বলা হয়, আর তন্নিম্নস্থ অংশকে "গ্লেশিয়ার" বলা হইয়া থাকে।

যে বরফরাশি আমরা নদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে গিয়া দেখিতে পাই, সে সমস্তই তবে কি বহু দূরস্থিত পর্ব্বত শিখরের ঐ সকল তুষার প্রান্তর হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছে? যে সকল পর্ব্বতাকার হিম শিলা গ্রীষ্মপ্রধান সাগর পর্য্যন্তও ভাসমান হইয়া আসে, তাহাও কি পর্ব্বত শিখরের তুষার স্তূপের অবস্থাভেদ মাত্র? কঠিন বরফ কি তবে তরল বা অর্দ্ধ তরল পদার্থের ন্যায় যথার্থই পর্ব্ব-

তের গা বহিয়া হিম নদীরূপে অবতরণ করে? কি হইতে যে কি হয়, প্রকৃতির কত নিয়মই যে আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপরে যাহা নির্দ্ধারিত হইল, তাহা পরিদর্শকের বিচারের সম্ভাবিত ফল মাত্র। তুমি, আমি, কি আর কেহ, যে হিমনদীর অবস্থা ও উৎপত্তি স্থানের বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখিবে, সেই উপরোক্তরূপ বিচার না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তথাপি বৈজ্ঞানিক বিষয় সকলে এত অনুমান প্রশ্রয় পায় না। ইহারও যুক্তি ও প্রমাণ আবশ্যক।

আমরা এবার প্রমাণিত করিব যে, যথার্থই হিম নদী এই তুষার প্রান্তরের নিম্ন তলের বরফ হইতে উৎপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। বরফ যে চলে, তদ্বিষয়ে এক কালে ঘোর সংশয় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতদিগের অপরিমেয় অধ্যবসায়ের ফলে অব্যর্থরূপে নির্ণীত হইয়াছে, কোন সন্দেহই নাই।

প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই যে, বরফ যদি না চলে, তবে, কতকাল হইতে ঐ সকল উপত্যকা ও গলি বরফে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে? সূর্য্যের উত্তাপে নিয়ত উহার উপরিভাগ দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে, অথচ কমিয়া কমিয়া নিঃশেষ হয় না কেন? তুষার রেখার উপরকার কথা যেন একটু স্বতন্ত্র, কেন না, সেখানে বায়ুর উত্তাপ এত অধিক নহে যে, সমস্ত বরফ দ্রব হইয়া যায়। বৎসরে গড়ে যে তুষারই পড়ে তাহাই যখন সমস্ত গলিয়া যাইতে পারে না, তখন অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে সঞ্চিত বরফ রাশি দ্রব হইয়া যাওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। গ্রীষ্মের উত্তাপে যেটুকু গলে, শীতের প্রচুর তুষারপাতে সেটুকু আবার পূর্ণ হয়। কাজেই তুষার রেখার উপরিস্থ ভাগে একথা ঠিক খাটে না; কিন্তু তন্নিম্নে কেন সমস্ত বরফ গলিয়া যায় না? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত—আদৌ এই সকল স্থানে বরফের অস্তিত্বই বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। পর্ব্বতের শিখর দেশ যে চিরতুহিনাচ্ছন্ন হয়, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি; কিন্তু যদি এই বরফের প্রকাণ্ড জিহ্বা উক্ত তুষার প্রান্তর হইতে উৎপন্ন না হইল, তবে কোথা হইতে আসিল? আর সকলেরই, মূলে ঐ প্রান্তরের সহিত যোগই বা কিরূপে সম্পন্ন হইল? পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এই সকল স্থানে এই বরফ সংস্থিত ছিল; ইহাত বিজ্ঞানের উপহাসের কথা। তবে কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয়ই তুষার প্রান্তর ইহার মূল। ঐ অগ্রভাগ নিশ্চয়ই এক সময়ে মূল প্রান্তরস্থ তুষারের সহিত সংলগ্ন ছিল বলিতে হইবে। সুতরাং উহাকে তুষার প্রান্তর হইতে এত দূর চলিয়া আসিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই।

তৃতীয়ত—যদি ইহাকে তুষার প্রান্তর হইতে উৎপন্ন না বলা যায়, তবে উপরিস্থ অতিরিক্ত তুষার স্তূপ কি হয়, ভাল করিয়া বুঝা যায় না, একথা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে তাহার আর বিচার করা অনাবশ্যক।

চতুর্থত—অধিকাংশ হিমনদীর মুখভাগ হইতেই একটী না একটী জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া নদী রূপ ধারণ করিয়াছে; এখন এই জলস্রোত যে ক্রমাগত চলিতেছে, এই ক্ষতি পূরণের উপায় কি? যদি পশ্চাৎ

হইতে নূতন বরফ আসিয়া দ্রবীভূত বরফের স্থান পূর্ণ না করিত, তাহা হইলে যত বড়ই কেন বরফ প্রবাহ হউক না, শত শত বৎসরের পর তাহার চিহ্ন মাত্রও থাকিত না, এবং ঐ জলস্রোতের মূল ক্রমেই উপরে উঠিত। কদাচ এক বা সমভাবে এইরূপ কার্য্য চলিতে পারিত না।

পঞ্চমত—হিমনদী মাত্রেরই মুখভাগে যে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড সকল দেখা যায়, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহাদিগকে প্রান্তস্থ প্রস্তর রাশি বলা গিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহারা কোথা হইতে আসিল। যদি বলা যায় যে, সেই স্থানেরই পর্ব্বত পার্শ্ব হইতে পড়িয়াছে, তাহা হইলে চলিবে না। কেন না, তাহাদের সংখ্যা এতই অধিক ও এরূপ স্তূপে স্তূপে সাজান যে, তাহারা কদাচ সেই স্থানের হইতে পারে না। হিম নদীর অন্যান্য অংশে যেরূপ প্রস্তর রাশি দেখা যায়, এখানে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। তাহার কারণ বুঝা যায় না। যেমন স্রোত প্রবাহ চলিতেছে, অমনি নূতন নূতন প্রস্তরমালা নদী পৃষ্ঠে নীত হইয়া ঐ একই স্থানে পড়িতেছে। কাজেই অন্যান্য সকল স্থল অপেক্ষা এইখানে উপল-সংখ্যা অনেক অধিক। এই রূপ ব্যতীত উহাদের কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তদ্ভিন্ন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, যে জাতীয় প্রস্তর সকল ঐ স্থানে পতিত থাকে, তাহার হয়ত কোন চিহ্নই সেখানকার পর্ব্বতের গায়ে দেখা যায় না, সুতরাং তাহারা বহমান হইয়া না আসিলে আর অন্য কোন উপায়ই নাই। আরও প্রমাণ আছে। ঐ সকল প্রস্তরের অনেকের গায়ে এমন সকল চিহ্ন আছে যেন তাহাদের উপর দিয়া কোন কঠিন দ্রব্য ঘসিয়া সোজা সোজা লম্বা লম্বা দাগ পড়িয়াছে। এক এক খণ্ড পাথর এমন লম্বা ভাবে ঠিক সোজা অবস্থিত যে, তলার বরফ গলিয়া গিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে উক্ত অবস্থায় বসাইয়া না দিলে অন্য কোন উপায়ে তাহার সেরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব নহে। এ সকল কথা প্রথম প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদের কারণ এখন সকলে সহজে বুঝিবেন। নদী-মুখের সন্নিকটে যে সকল ঢিবি ঢিবি প্রস্তর উভয় পার্শ্বে দেখা যায়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদের উপরিভাগ বেশ সুগোল পালিশ করা, ঠিক কচ্ছপের পৃষ্ঠের মত। তাহাদের উপর দিয়া বরফের স্রোত না চলিলে তাহাদের উপরিদেশ কখনও এরূপ আকার ধারণ করিতে পারিত না।

ষষ্ঠত—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক হিমনদীর উভয় পার্শ্বে এক এক সারি প্রস্তরমালা দেখা যায়, ইহাদিগকে পার্শ্বস্থ প্রস্তর রাশি বলে, এই সকল কোথা হইতে আইসে? অতি সহজেই তাহার মীমাংসা হয়। আমরা দেখিয়াছি, কোথাও কিছু নাই, মধ্যে মধ্যে ভীষণ শব্দ করত পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে বড় বড় উপলখণ্ড সকল স্খলিত হইয়া নদীপৃষ্ঠে পতিত হয়। ইহারাই সাধারণত উহার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উক্ত প্রস্তর-রাশি উৎপাদন করে। তদ্ভিন্ন আরও এক প্রকারে প্রস্তর-স্খলন দেখিতে পাওয়া যায়। হিমনদীর উভয় পার্শ্বে ঠিক বরফ ও প্রস্তরের সম্মিলন স্থলে প্রায়ই এরূপ দেখা যায় যে, এক খণ্ড বড় পাথরের একটা কোণ

বরফের মধ্যে খানিকটা ছিল, হঠাৎ ভয়ানক শব্দ করিয়া সম্মুখদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইহার অর্থ কি? একটু বুঝিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, উহার কারণ—ঐ বরফের সম্মুখদিকে গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বরফ কঠিন পদার্থ—পাথরের গায়ে ঠেকিয়াছিল; বরফ সম্মুখে চলিতে যায়, পশ্চাৎ হইতে চাপ আসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিতেছে, কাজেই সে আগে যাইতে চায়; কিন্তু পর্ব্বত পার্শ্বস্থ পাথরের কোণ সম্মুখে থাকিয়া তাহাকে বাধা দিতেছে। কিছুকাল উভয়ে বলপ্রকাশ করিল, কিন্তু বরফের বহু দূরের প্রযুক্ত বল, পাথরের শক্তিকে হারাইয়া দিল। শেষে পাথরখানা ভাঙ্গিয়া গেল ও পার্শ্বস্থ পাথর রূপে পরিণত হইল। সুতরাং এখানেও বরফের ধীর কিন্তু অবাধ গতি প্রমাণিত হইতেছে।

সপ্ত মত—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রায় সমস্ত বড় হিমনদীরই মধ্যভাগে, পার্শ্ব হইতে শত শত গজ দূরে, পার্শ্বস্থ প্রস্তররাশির সমদূরবর্ত্তী আরও এক, দুই, বা ততোধিক শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তরমালা দেখা যায়, তাহাদিগকে মধ্যস্থ প্রস্তররাশি বলে। এই বার পাঠক, বলুন দেখি এই গুলি কিরূপে কোথা হইতে আসিল? যে নদীতে উপনদী মিশে নাই, তাহাতে এরূপ দেখা যায় না; যাহাতে একটী উপনদী মিশিয়াছে, তাহার মধ্যভাগে একটী মাত্র শ্রেণী দেখা যায়, দুটী মিলিলে দুই শ্রেণী, এইরূপে যতই উপনদীর সংখ্যা বাড়িতে দেখা যায়, ততই এই জাতীয় প্রস্তরশ্রেণীর সংখ্যা বাড়িয়া থাকে। ইহার কারণ কি? হিমনদীর গতি স্বীকার করা ভিন্ন এখানে আর অন্য উপায় নাই। প্রতি প্রবাহের দুই ধারে একটী একটী করিয়া পাথরের সারি থাকে। বেশ,—এখন মনে করুন, একটী প্রবাহ আর একটীর সহিত বামপার্শ্ব হইতে মিলিত হইল। তাহা হইলে মূল প্রবাহের বাম পার্শ্বস্থ প্রস্তরমালার সহিত সর্ব্ব প্রথমেই উপপ্রবাহের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রস্তরমালার সাক্ষাৎ হইবে। এবং এই দুটী প্রবাহ মিশিয়া যাইবে; তখন উক্ত সম্মিলিত প্রস্তর শ্রেণী পূর্ব্ববৎ মূল প্রবাহের বামদিকে ও উপপ্রবাহের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া যাইবে, অর্থাৎ উহা ঐ সম্মিলিত প্রবাহের মধ্যভাগে অবস্থিত হইবে। এইরূপে সমস্ত মধ্যস্থ প্রস্তর শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এবং বাস্তবিকই কোন হিমনদীর মধ্যস্থ শ্রেণীর সংখ্যা গণনাদ্বারা তাহার উপনদীর সংখ্যা বলিয়া দিতে পারা যায়। তবে যদি অনেক গুলি আসিয়া একত্র মিশে, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে নদীবক্ষে প্রস্তর রাশি এত গোলযোগে আলুথালু ভাবে ছড়ান থাকে যে, তাহাদের মধ্যে কিছুই বাহির করা যায় না। যাহাই হউক, মধ্যস্থ প্রস্তররাশির অস্তিত্বেই হিমনদীর গতি বেশ সপ্রমাণ হয়।

অষ্ট মত—হিমনদীর যে গতি আছে তাহার আর একটী প্রবল প্রমাণ—তাহার ফাটল। এই সকল ফাটল নানা জাতীয় হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম কেশ সদৃশ সামান্য চিড় হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি প্রকাণ্ড ভীষণ পর্ব্বত গহ্বরের ন্যায় পর্য্যন্তও দেখা গিয়া থাকে। চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে "কট কট" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এই শব্দ আর কিছুই নয়, বরফ ফাটিতেছে। কিন্তু জন্মমাত্র ফাটলকে দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা তখন এতই সূক্ষ্ম! ক্রমে সেই সূক্ষ্ম ফাটলই এত বড়

হইয়া থাকে যে, সে দিকে তাকাইলে ভয় হয়। এই সকল কাটলের অর্থ কি? বরফ যদি স্থিরভাবে থাকিত, তবে তাহাতে এরূপ কাটল হইবার কি সম্ভাবনা? বরফ চলিতেছে বলিয়াই, যখন কোন বাধা পায় অমনি কাটিয়া যায়, এক ভাগ হয়ত বেশী অগ্রসর হয়, আর এক ভাগ পারে না, কাজেই উভয়ের মধ্যে ফাঁক হইয়া যায়। কাটল সকল কিন্তু অধিক দিন থাকিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অপর এক কাটল পূর্ব্বের কাটল পুনরায় জুড়িয়া যাইতে দেখা যায়। ইহা হিম নদীর গতির পক্ষে অব্যর্থ প্রমাণ। যে কারণেই কাটল জন্মাক না কেন, বরফের গতি না থাকিলে জুড়িয়া যাওয়া অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন আরও একটা অকাটা প্রমাণ কাটলের উপর নির্ভর করে। তাহা এই—আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের "গ্রাণ্ডপ্লেটো (Grand Plateau) নামক স্থানে একটী ভীষণ কাটল দেখা যায়। এই কাটল চিরকাল এক নাই, মধ্যে মধ্যে ইহা জুড়িয়া যায় ও সেই স্থলে নূতন কাটলের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, এই ভয়ানক গহ্বরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে একটা তুষার পিণ্ডের (Avalanche) আঘাতে তিন জন লোক পতিত হয়। যদি হিমনদীর বরফ অচল হইত, তাহা হইলে এই গহ্বরের মধ্যেই ঐ তিন জনের মৃত দেহ চির দিন থাকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। যথার্থই সে দিন, ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে, ঐ তিন জনের মৃত দেহের অবশিষ্টাংশ অনেক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে (Glacier Bossons) নামক হিমনদীর প্রান্তভাগের উপরে দেখা গেল! আশ্চর্য্য! এই ৪০টা বৎসর বরফের শীতে তাহাদের কঙ্কাল রক্ষিত হইয়াছিল! এত দিন গভীর বরফের মধ্যে নিহিত ছিল; ক্রমে উপরিভাগের বরফ যত গলিয়া যাইতে লাগিল, ততই নীচের বরফ উপরে দেখা দিতে আরম্ভ হইল। সুতরাং গতিশীল বরফের সঙ্গে সঙ্গে তন্মধ্যে প্রোথিত নরদেহও এতদূর চালিত হইয়া শেষে উপরের বরফের তিরোধানে বাহিরে দেখা দিল।

এ পর্য্যন্তও আমরা কেবল চিহ্ন দেখিয়া আনুমানিক প্রমাণ গুলির কথা বলিলাম। যদি কেহ ইহাতেও সন্দিহান হন যে, হয়ত অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে যাহা দ্বারা উপরোক্ত প্রকার ঘটনা সকল সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমরা আরও অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অমিত উৎসাহ ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের কল্যাণে আমরা এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহারা বাস্তবিকই এক, দুই, তিন, করিয়া ইঞ্চ ইঞ্চ পরিমাণে হিমনদীর দৈনিক, এমন কি প্রতি ঘণ্টার গতি নির্দ্ধারণ করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। এ বিষয় এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, সংক্ষেপে তাহার কথা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সকল বিষয়েরই প্রথমে অনুমান হইতে আরম্ভ করিয়া পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণে উপস্থিত হইতে হয়। এখানেও তাই। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ গুলি অবলোকনে সন্দেহ ও অনুমান, তৎপরে আরও অকাট্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুসন্ধান। রোন ও আভীরণ নদীর ন্যায় সুইজর্লণ্ডের "আর্" নামক নদীরও উৎপত্তিস্থান একটা হিমনদী, তাহার মূলভাগের নাম "উতেরার্"। এই প্রকাণ্ড হিমনদীর মধ্যস্থ প্রস্তর রাশির মধ্যে

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিউজী' নামক এক জন ঐ দেশীয় পণ্ডিত, একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, এ হিমনদীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। যেখানে তিনি কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার উভয় দিকের পর্ব্বতের গায়ের বস্তু সকলের সঙ্গে সমসূত্রে তাহার অবস্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিন বৎসর পর্য্যবেক্ষণের পর দেখিলেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুটীর পূর্ব্ব স্থান হইতে ৩৩০ ফিট নীচে আসিয়াছে। ১৮৩৬খৃঃঅব্দে দেখা গেল যে, ঐ কুটীর ২৩,৫৪ ফিট নামিয়া আসিয়াছে। এবং ১৮৪১ অব্দে "আগেসিজ্" সাহেব দেখিলেন, উহা ৪,৬১২ ফিট নীচে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। ১৮৪০ অব্দে ইনি কতিপয় দুঃসাহসিক বন্ধু সমভিব্যাহারে এই হিমনদীর উপর "নিউসাটেল হোটেল" নামক আর একটী কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। দুই এক বৎসর পরে দেখা গেল যে, ঐ হোটেল ৪৮৬ ফিট নীচে অগ্রসর হইয়াছে।

কত কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাগুক্ত মহাত্মাদ্বয়, কয়েক বৎসর পরিশ্রমের পর, যে সত্য লাভ করিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী পরিদর্শকগণ কয়েকটী যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকমাত্র ঘণ্টার মধ্যেই সেই সত্য ও তদপেক্ষা আরও বিস্ময়কর বিষয় সকল নিঃসংশয়ে সুপ্রমাণিত করিতে সমর্থ হইলেন। আবাসিজ্ সাহেব স্বয়ং ও অনেক বিষয় নূতন আবিষ্কার করেন। তাঁহার চেষ্টা ও প্রফেসার ফর্বেস নামে আর এক জন পণ্ডিতের যত্নে আমরা হিমনদী সম্বন্ধে অনেকানেক কৌতুকজনক ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ফর্বেস্ সাহেবের "আল্‌স্ ভ্রমণ" নামক গ্রন্থে তাঁহার পরিদর্শনের অনেক কথা দেখা যাইবে, ইহাতে তিনি পূর্ব্বোক্ত মার ডি গ্লেস্ নামক হিমনদীর বৃত্তান্ত পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাহার পর যে সকল বিষয় আবিষ্কৃত হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। ইহারা "থিয়োডলাইট" নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উক্ত মার ডি গ্লেস্ হিমনদীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। বরফের উপর এই যন্ত্র দ্বারা বিস্তার দিকে সোজা সরল রেখা ক্রমে কয়েকটী বড় বড় কাটি পুতিয়া দেওয়া যায় এবং উহাতে যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে ঐ কাটি গুলির স্থানের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। কোন কাটি কতক্ষণে কত ইঞ্চ নড়িয়াছে তাহা অতি অভ্রান্ত রূপে অবগত হওয়া যায়। এই উপায়ে নিঃসংশয়ে হিমনদী সম্বন্ধে অনেক গুলি সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কাটীর গতি মাপিয়া তাহাদের অনেকেরই মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২।১টী এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। মার ডি গ্লেস নদীটীর একস্থানে ১৫ টী সমসূত্রবর্ত্তী কাটীর এক দিনের গতি নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

কাটী—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ইঞ্চ—১১ ১৪ ১৩ ১৫ ১৫ ১৬ ১৭ ১৯ ২০ ১৯ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১০। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দুই পার্শ্বের দুটী কাটী সমস্ত দিনে প্রায় সমান পথ অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু মধ্যভাগের কাটী গুলি ক্রমেই বেশী দূর চলিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মাঝের বরফ ধারের বরফ অপেক্ষা বেশী দূর চলিয়াছে, অর্থাৎ তাহার গতি অধিক। এই রূপ নিয়ম সর্ব্বত্র দেখা

যায়। যেখানেই হিমনদীর গতি সরল, বাঁক নাই, সে সব স্থানেই বরফ দ্রুত চলে। এ বিষয়ে বরফ অবিকল নদীর ন্যায়। সকলেই জানেন যে, নদীর স্রোত কিনারা অপেক্ষা মধ্যস্থলে অধিক প্রবল। এখানে আমরা অনেক মাপের মধ্যে যে একটীমাত্র মাপ দিলাম, তাহা দ্বারা বরফের নদীর পক্ষেও ঐ সত্য সম্পূর্ণ সঙ্গত প্রমাণিত হইল।

যখন কোন নদীতে বাঁক পড়ে, তখন ঐ বাঁকের যে দিকটা বেশী ঘোর, সে দিকের জলের স্রোত, যে দিকে কম ঘোর সে দিকের অপেক্ষা অধিক হয়, একথা সকলেই জানেন। বরফের নদীতেও ঠিক তাই। নিয়ে যার ডি গ্লেসের আর একটী দিনের এক স্থানের যে মাপ দিলাম, তদ্বারাই বুঝিতে পারিবেন।—

কাটী পূর্ব্ব—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৫ পশ্চিম
ইঞ্চ— ৭ ৮ ১৩ ১৫ ১৬ ১৯ ২০ ২১ ২১
২৩ ২৩ ২১ ২২ ১৭।

ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? এবারেও পূর্ব্বের নিয়ম ঠিক রহিল। এখানেও মধ্য স্থলের গতি উভয় পার্শ্বের গতি অপেক্ষা পশ্চিম পার্শ্বে অধিক দ্রুত বেগে চলিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। আর যদি হিমনদীর চিত্র দেওয়া যাইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে উহার পশ্চিম পার্শ্ব বাস্তবিকই পূর্ব্ব পার্শ্ব অপেক্ষা অধিক ঘোর। তৎপরে আর এক স্থানে যে বাঁক আছে, তাহার পশ্চিম দিক অপেক্ষা পূর্ব্বদিক বেশী ঘোর। সেই স্থানের কাটীর এক দিনের গতি নিয়ে দেওয়া গেলঃ—

কাটী পূর্ব্ব—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
১০ ১১ পশ্চিম
ইঞ্চ— ২০ ২৩ ২৯ ৩০ ৩৪ ২৮ ২৫ ২৫ ২৫
১৮ ১৯

আর অধিক মাপ দিবার আবশ্যক নাই; যথেষ্ট প্রমাণিত হইল যে, এ সম্বন্ধে হিমনদী ও আমাদের সাধারণ নদীতে কোন প্রভেদ নাই। যখন বাঁক থাকে না, তখন ঠিক মধ্য স্থলের গতি দুই পার্শ্বের গতি অপেক্ষা দ্রুত হয়। বাঁকের মাথায় যে দিকের ঘোর বেশী, সে দিকের জল ও বরফ দুএরই গতি অধিক দ্রুত।

আরও আছে। যখন কোন নদী প্রশস্ত অবস্থা হইতে হঠাৎ অপ্রশস্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া অল্প প্রশস্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়। এখানে বরফের ও সেই নিয়ম দেখা যায়। হিমনদী যখন কোন প্রশস্ত উপত্যকা হইতে সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হয়, তখন উহারও বেগ অধিক হইয়া পড়ে। এই রূপে দেখা যায় যে, সর্ব্ব বিষয়েই প্রায় জল ও বরফ উভয় জাতীয় নদীর গতির নিয়ম একই প্রকার, প্রভেদ কেবল গতির দ্রুততায়। এমন কি, নদীর তলদেশের জল অপেক্ষা উপরিভাগের জল যেমন অধিক বেগে চলে, পণ্ডিতেরা হিমনদীতেও এই সত্যটী প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রকাণ্ড ফাটালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার গায়ে কাটী পুতিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, বরফের তলদেশ অপেক্ষা উপরিভাগ অধিকতর বেগে চলে। যেমন যার ডি গ্লেসের মাপ দেওয়া গেল, সেইরূপ অন্যান্য অনেক হিমনদীর এই বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে; ও তাহাতে এই সাদৃশ্য সম্পূর্ণ রূপেই প্রমাণ করা হইয়াছে।

এক্ষণে একটা কথা সহসা সকলেরই মনে উদয় হইতে পারে যে, হিমনদী কঠিন

বরফময় হইয়াও কিরূপে তরল নদীর ন্যায় চলে। এই প্রশ্ন অনেক দিন এ বিষয়ের অনুসন্ধানকারী বড় বড় পণ্ডিতদিগকেও চিন্তিত করিয়াছিল। অনেক দিন ইহার কিছু মীমাংসা করিতে তাঁহারাও সমর্থ হন নাই। একথাটীও বড় কৌতুকজনক। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে; অন্য এক সময়ে এ সম্বন্ধে লিখিবার রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্মশানে নিশান।

ব্রহ্মপুত্র তীরে—সন্ধ্যার সময়।

বৈশাখের শেষ দিন—মেঘে অন্ধকার;—
দিনমান প্রায় শেষ,ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার।
উলঙ্গ—এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
নয়নে কালাগ্নি ঢালি,উন্মত্তা শ্মশান-কালী
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কার!
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজ্জ্বলা,
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ মালা!

১

নিরখি সে ভীমছায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কায়া,
ভয়ে যেন ব্রহ্মপুত্র গেছে মসী হয়ে,
আতঙ্কে কাঁপিছে বুক, নাহি শান্তি একটুক
তরঙ্গ তুফান তার ছুটিছে হৃদয়ে,
আজি তারা শশধর, ওঠেনি গগন পর,
অমর পেয়েছে ডর মরণের ভয়ে,
এমন ভীষণ দৃশ্য, বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব
এখনি হইবে ধ্বংশ মহান্ প্রলয়ে!

২

হেন ঘোর অন্ধকার,—এ হেন সময়
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান,
অর্দ্ধ দগ্ধ বংশদণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন লণ্ড ভণ্ড
এখানে ওখানে পড়ে শয্যা-উপাধান!
ছড়ারিটী কানাকড়ি, কোথাও কলসী দড়ী,
কোথাও বা ছাই ভস্ম অঙ্গার নির্ব্বাণ!
কোথাও মাথার খুল,ছেঁড়া নখ ছেঁড়া চুল,
কোথাও বা অস্থিখণ্ড রয়েছে বিছান,
ঘোর স্তব্ধতার শিরে,সে নিস্তব্ধ নদী তীরে,
স্তিমিত স্তম্ভিত ঘোর গম্ভীর সে স্থান,—
উড়িতেছে "পত-পত" শ্মশানে নিশান!

৩

"শ্মশানে নিশান কেন?" হাসে খল খল,
মড়ার মাথার খুলি, বিকাশিয়া দন্তগুলি
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র ধবল ধবল!
সবে করে উপহাস, ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ
বিছানা কলসী দড়ী মিলিয়া সকল!
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খল খল!

৪

দিগন্তে সে অট্ট হাসি হয় প্রতিধ্বনি,
বিকট ভৈরবে হাসে আসন্না রজনী!
জ্বলে মুহুঃ বজ্রানল, গর্জ্জে মুহুঃ মেঘদল,
হইতেছে চূর্ণ চূর্ণ ভূধর মেদিনী!
প্রকৃতির বিশ্বনাশী, এ ঘোর প্রলয় হাসি,
সহিতে পারে না যেন প্রকৃতি আপনি!
বজ্র নখে বক্ষ চিরে, দেশাস্ত যেতেছে ছিঁড়ে
প্রচণ্ড হাস্যির চোটে কম্পিয়া ধরনী,
সহিতে পারে না কাজি প্রকৃতি আপনি!

৫

দেখিলাম অকস্মাৎ রজত জ্যোৎস্নায়,
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়!
রজত ধুতুরা কর্ণে, বিমল রজত বর্ণে,
রজত বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়!
রজত গিরির শিরে, রজত জাহ্নবী নীরে,
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায়!
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়!

৬

কিবা সেই সৌম্যমূর্ত্তি অমল ধবল,
ধবল বৃষভ পর, বিরাজিত বিশম্ভর
ধবল অস্থির মালা গলে দল মল!
ধ্যানগত আত্মা তার, নাহি দেখে ত্রিসংসার,
জ্ঞানময় মহা মূর্ত্তি স্থির অবিচল!
বিশ্ব বিনাশের হেতু, বিবেকী সে বৃষকেতু
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্জল,
শ্মশানের জয়ভেরী, বাজাইয়ে ত্রিপুরারী
ভৈরবে গাহিছে গীত, 'মরণ মঙ্গল'!
আতঙ্কে অবনী যেন করে টল মল!

৭

ছুটিছে ভৈরব রাগ কাঁপায়ে বিমান,
"গাও মরণের জয়, গাও শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পবান্!
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান!
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা গর্ব্ব করে তার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান্!
গাওহে সকলে তুলি, মড়ার মাথার খুলি,
বাজাও বিকটে বাদ্য কাঁপাও বিমান!
নাচ ভূতগণ মিলে, কোথা হ'তে কে আসিলে,
শুনাও ভৈরব কণ্ঠে সে ভূত বিজ্ঞান!
তুলে ও চিতার ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
গাওহে ভৈরব কণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান!

৮

গাওহে ভৈরব কণ্ঠে গম্ভীরে সে গান,
গাও স্বরে পঞ্চভূত, বিজয়ী শ্মশান দূত
সংসার জয়ের সেই সঙ্গীত মহান্!
"যাহা কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,—
ভয় ভক্তি ভালবাসা ক্রোধ অভিমান!
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, সুখ কিম্বা দুঃখক্লেশ
যশ কিম্বা অপযশ মান অপমান!
বীরের বীরত্ব পূর্ণ, হৃদয় হইবে চূর্ণ,
ভীরুর বিভয় বক্ষ রেণুর সমান!
রাজার কীরিট গর্ব্ব, এখানেই হবে খর্ব্ব,
দাসের দাসত্ব ক্লেশ হবে অবসান!
জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বল, সব যাবে রসাতল,
মুছে যাবে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান!
মড়ার মাথার খুলি, বাজাও সবলে তুলি
কর সে ভৈরব নৃত্যে ধরা কম্পবান!
তুলে ওই ভস্ম ছাই, জীবেরে দেখাও তাই
কেন করে বৃথা গর্ব্ব বৃথা অভিমান!
দেখুক্ এ শ্মশানের বিজয় নিশান!"

৯

ভূতের ভৈরব কণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান,
বিঘোর ভৈরব রাগে ছাড়িল সে তান।
"জয় মরণের জয়, জয় শ্মশানের জয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পবান!
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান!
বাসবের বজ্রছার, বৃথা তার অহঙ্কার
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান্!
যত কিছু——এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই
দেখরে মোহান্ধ জীব নির্ব্বোধ অজ্ঞান!"
শ্মশান নিশান খুলে, চিতা-ভস্ম তুলে তুলে
বাজায়ে মড়ার মাথা ভূত করে গান,
উড়িতেছে 'পত-পত' "শ্মশানে নিশান!"

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভবভূতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবের উপসংহার স্থলে বলিয়াছি যে, ভবভূতি ও বাল্মীকি এই উভয় কবিরই উদ্দেশ্য এক। সে উদ্দেশ্য, মানবের সমক্ষে, পাপ প্রলোভনময় জগতে, আদর্শ চরিত্রের সমাবেশ। কিন্তু উভয় কবিরই উদ্দেশ্য একই হইলেও, ভবভূতির প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার আদর্শ চিত্রে মানবত্বের সঙ্গে সঙ্গেই দেবোচিত গুণের সমাবেশ করিয়াছেন, বাল্মীকির ন্যায় অমর প্রকৃতিতে অমরত্বের আরোপ করেন নাই। যাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই দেবতা বলিয়া জানি, তাঁহাতে যে দেবত্বের চিহ্ন দেখিতে পাইব, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি? কিন্তু যদি কোন দিন জরা-মরণশীল মানবে অমরতার নিদর্শন, পৃথিবীতে অমরাবতীর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে পাই, তবে সেই দিন যথার্থই বিস্মিত হইব। কিন্তু নায়কগণ অপেক্ষা গ্রন্থের প্রতিনায়কগণ সম্বন্ধে বাল্মীকি ও ভবভূতির পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট। অনার্য্য জাতি ও অনার্য্য সমাজের প্রতি যে ঘৃণা রামায়ণের প্রতি পংক্তিতে বর্ত্তমান, ভবভূতির গ্রন্থে তাহার আভাষ মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমাংশে এ বিষয়ের বহুল পরিমাণে উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আর তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। কেবল সংক্ষেপে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভবভূতি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিলেও সকল বিষয়ে বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। অনুসরণ দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে কাব্যের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য তিনি বাল্মীকি বর্ণিত অনেক অংশের প্রতিবাদই করিয়াছেন। বাল্মীকির অনুসৃত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যুক্তিযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্র, এবং তাহা এ স্থলে আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়ও নহে। কিন্তু বাল্মীকির অনুসরণ না করিয়া, তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের বিবেচ্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বীর-চরিত ভবভূতির গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম। বীর-চরিতে রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্রাশ্রমে গমন হইতে, বনবাসাবসানে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ পর্য্যন্ত, সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কবি, রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত ও শৈশব-চরিত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ঘটনা পূর্ণ অংশই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বস্তু রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা রামায়ণের ছয় কাণ্ডে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তিনি একখানি মাত্র নাটকে তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জন্য হয়ত বহু বৎসরের ঘটনা, তাঁহাকে একটী অঙ্কের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে। যে সকল ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য রামায়ণের অধ্যায়ের পর অধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছে, তাহার জন্য হয়ত তিনি একটী মাত্র শ্লোকই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এরূপ স্থলে প্রতি-

পাদ্য বিষয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ঘটনা রাশির সংঘর্ষণে, এবং নানা জাতীয় বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের সমাবেশে, গ্রন্থখানি একটী সুবিশাল অরণ্যানীর ন্যায় গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সেই বিশাল কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, পাঠক আপনার গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহার মহান্ বনস্পতিগণের ছায়ায় তিনি অন্ধ প্রায় হইয়া যাইবেন। গাম্ভীর্য্যে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে সত্য, কিন্তু তিনি ভাবিবেন যে, এ কাননের কি শেষ নাই, এ আলোক-সংশ্লিষ্ট অন্ধকারের কি বিরাম নাই? তখন তাঁহার হৃদয় সেই অন্ধকারের রাজ্য হইতে আলোকে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। এবং সেই নিবিড় বনের অন্তরাল হইতে পত্র রাশির বিচ্ছেদ স্থানে সূর্য্যালোক দেখিতে পাইলে, তিনি পুলকিত হৃদয়ে তাহার পানে চাহিয়া দেখিবেন। আমরা এইবার সেই বিশাল অরণ্য সদৃশ ভবভূতির বীরচরিতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব। এবং যে গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের জন্য ভবভূতির গ্রন্থ সমূহের এত সমাদর, তাহা পাঠকগণের নিকট প্রদর্শিত করিবার প্রয়াস পাইব।

বীরচরিত সাত অঙ্কে পরিসমাপ্ত। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় আমরা সূত্রধার মুখে অবগত হইব, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞ রক্ষার জন্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আপনার আশ্রমে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ রাজর্ষি জনককেও এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু জনকও স্বয়ং যজ্ঞ কার্য্যে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত বিশ্বামিত্রাশ্রমে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে, ভবভূতি হিন্দু সমাজের একটী অতি সুন্দর চিত্র এ স্থলে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকা, নানা দেশ অতিক্রম করিয়া, পিতৃতুল্য গুরুজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন, এ দৃশ্য বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে অতি বিরল। আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, এ দৃশ্য অতি সুন্দর। আমরা ক্রমশঃ এইরূপে প্রসঙ্গ ক্রমে, হিন্দু সমাজের তৎকালীন অবস্থা পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

বীরচরিতের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য অতি সুন্দর। এই অঙ্কে রামচন্দ্রের সহিত সীতার প্রথম দর্শন। যাঁহাদিগের জীবন হিন্দুসন্তানের আদর্শ স্বরূপ, যাঁহাদিগের চরিত্রের প্রভাব হিন্দু জীবনের অস্থিমাংসের সঙ্গেং সম্মিলিত, বীর-চরিতের প্রথমাঙ্কে, সেই হিন্দু নরনারীর আদর্শস্বরূপ দম্পতীর প্রথম সাক্ষাৎ। রাজা কুশধ্বজ বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছেন। রামচন্দ্রও লক্ষণের সহিত যজ্ঞ রক্ষার জন্য সেখানে বর্ত্তমান। সেই কৌশিকী পরিক্ষিপ্ত বনভূমে, হরিতপরিসরারণ্য রমণীয় সিদ্ধাশ্রমে সীতা ও রামচন্দ্র পরস্পরকে প্রথম সন্দর্শন করিলেন, পরস্পরের হৃদয় বিগলিত হইল। উভয়ে ভাবিলেন, কি সুন্দর কি প্রিয়দর্শন! কিন্তু এ অনুরাগ কেবলই ইন্দ্রিয় গত, এ মোহগুণজনিত নহে; ইহাত রূপের

আসক্তি। গ্রন্থকার সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গেই সেই অনুরাগ যাহাতে বদ্ধমূল হইতে পারে, তজ্জন্য একটী অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করাইলেন। নেপথ্যে শব্দ হইল 'জয় জয় জগৎপতি রামচন্দ্রের জয়' সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলেন, গৌতমপত্নী অহল্যা, রামচন্দ্রের প্রভাবে অন্ধ তামিস্র হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। সীতার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "সরীর নিম্মাণ সরিসো নং সে অণুভাবো।" "দেখিতেছি ইনি দেখিতেও যেমনই সুন্দর ইহার প্রভাবও, তাহার অনুরূপ"। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে শারীরিক সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত হইয়াছিল, মানসিক সৌন্দর্য্যে তাহা আরও আকৃষ্ট হইল। অজ্ঞাতভাবে যে বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা বদ্ধমূল হইল। সীতা দেখিলেন, যে রামচন্দ্র কেবলই সৌন্দর্য্যের অবতার নহেন, তিনি করুণারও অবতার। স্বামী যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সমাজ যাঁহাকে কলঙ্কিণী বলিয়া চিরান্ধকারে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই হতভাগিণী অহল্যা তাঁহারই প্রসাদে মুক্তি লাভ করিল। তিনি দেখিলেন যে, রামচন্দ্র পাপীকেও ভালবাসিতে জানেন। মুগ্ধস্বভাবা বালিকার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। সীতা ভাবিলেন, আজ ইহাকে দেখিলে আমার লোচন এত পরিতৃপ্ত হয় কেন? ইহাকে দেখিবার জন্য মনে মনে এত সাধ হয় কেন? কেবলই কি সীতার হৃদয়ে এই অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা নয়। রামচন্দ্রও ভাবিতেছিলেন "কি মিয়ং অমৃত বর্ত্তি রিব চক্ষু রাপ্যায়য়তি"। রাম সীতায় যে প্রেম সর্ব্বাবস্থাতেই সমভাবে বর্ত্তমান, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে যে প্রেমের বিরাম ছিলনা, তাহা এইরূপে সেই পবিত্র বিশ্বামিত্রাশ্রমে পরস্পরের সন্দর্শনে সমুৎপন্ন হইল। রাম ও সীতাকে দেখিয়া রাজা কুশধ্বজও ভাবিতে ছিলেন, যে " দাদা যদি হর ধনু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা না করিতেন, তবে রামচন্দ্রের হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিতাম "। এমন সময় সংবাদ আসিল যে, রাক্ষসাধিপতি রাবণের দূত, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্র তাহাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবার অনুমতি দিলেন। পরস্পর অভিবাদন ও কুশল প্রশ্নের পর দূত বলিল, যে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার পাণি-গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহাকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র ও কুশধ্বজ উভয়েই রাবণের এরূপ প্রার্থনায় কি উত্তর দিবেন চিন্তা করিতে ছিলেন। যাহার আদেশ জগতে কেহ কখন অন্যথা করিতে সাহস করিত না, তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা অল্প সাহসের কথা নহে। সীতা ভাবিতেছিলেন (১) হাধিক্ আমার অদৃষ্ট কি এতই কঠিন, রাক্ষস আমাকে বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। উর্ম্মিলা ভাবিতেছিলেন (২) "সে কি? অদৃষ্টে কি এই ছিল?" কিন্তু লক্ষণ আর সহ্য করিতে

কন্যা। সোম্ম দংশনা-কুসুএবে।
রাম। হুপ্রসন্নোজ্জ্বলা মূর্ত্তিরস্তা স্নেহং করোতি মে।

সীতোর্ম্মিলে। তদেব তৌপ্রতি কিত্তি সব্বই ইমস্থিং লোখ আনন্দে নে বিটি।
(১) হদ্দী হদ্দী তরুণদো নং পর্থেদি।
(২) উর্ম্মিলা। কহং এব্বং।

পারিলেন না। সেই সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা রাক্ষস হস্তে নিপতিতা হইবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, (৩) "দাদা, দাদা, দেখিতেছেন না যে রাক্ষসপতি রাবণ এই দেবীকে বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।" কিন্তু রামচন্দ্র উদ্বেগশূন্য। সুখ দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, হর্ষ ক্ষোভ, কোন অবস্থাতেই তাঁহার হৃদয়ের শান্তির বিপর্য্যায় ঘটিত না। অক্ষুব্ধ চিত্তে, স্থির ভাবে বলিলেন (৪) বৎস, কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে যখন অতি সাধারণ লোক পর্য্যন্তও তাঁহাকে বিবাহ প্রার্থনা করিতে পারেন, তখন পরমেশ্বরের প্রপৌত্র, জগতের জেতা রাজা রাবণ যে এ বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? রাক্ষস দূত, কুশধ্বজও বিশ্বামিত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি চিন্তা করিতেছেন? বিশ্বামিত্র প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় ভাবিতেছিলেন, প্রত্যাখ্যান করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে অপমানিত করিবার প্রয়োজন কি? তবে এমন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যাহাতে রাক্ষসরাজ আপনা হইতেই আমাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন। তিনি উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ দর্শনার্থে যে সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন, সুন্দপত্নী তাড়কা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছিল। তাহার সর্ব্ব শরীর শোণিত কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, নরকপাল, এবং নরাস্থি সমূহ অলঙ্কার রূপে তাহার অঙ্গে শোভা পাইতেছিল। তাহার বিশাল স্তনদ্বয় দ্রুতগমন বশতঃ বিকম্পিত হইতেছিল। বিশ্বামিত্র সেই ঘোররূপা রাক্ষসীকে দেখিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, বৎস, ইহাকে বিনাশ কর। যে রামচন্দ্র সীতাকে অন্য প্রার্থিতা দেখিয়া উদ্বেগ-শূন্য হৃদয়ে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, এখানেও সেই রামচন্দ্র। তাঁহার হৃদয় তেমনই নির্ভীক, তেমনই চিন্তা মাত্র বিরহিত। নিশ্চিন্তের ন্যায় অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, ভগবন্, "এ যে রমণী?" (৫) রামচন্দ্রের উত্তরে কুশধ্বজ বিস্মিত, রাক্ষসদূত স্তম্ভিত হইলেন। উর্ম্মিলা সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দিদি, শুনলেন, ইনি কি বল্লেন, শুন্‌লেন।"

এতক্ষণের পর আমরা মহাকবির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। একটী মাত্র কথায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ইঁহার রামচন্দ্র, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, সকল অবস্থাতেই অটল। যিনি অক্ষুব্ধচিত্তে অবনত মস্তকে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, হৃৎপিণ্ড দলিত করিয়া প্রাণের অধিক ধন সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্রের পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হইলাম। তাড়কা রামচন্দ্রের শরাঘাতে নিহতা হইল। রাক্ষস-দূত ব্যথিত হৃদয়ে প্রভুর অভিনব পরাজয় অনুভব করিয়া, কুশধ্বজ ও বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের অভিপ্রায় কি? বিশ্বামিত্র সেই অবসরে রামচন্দ্রকে তাড়কা বধের পুরস্কার স্বরূপ

(৩) লক্ষ্মণ। আর্য্য। আর্য্য। কিং নপশ্যসি নিশাচর পতির্দ্দেবী মিমাং প্রার্থয়তে।

(৪) সাধারণ্যাদনিরাতঙ্কঃ কন্যা বস্তোহপি যাপতে। কিং পুনর্জ্জগতাং জেতা প্রপৌত্রঃ পরমেষ্ঠিনঃ।

(৫) রাম। ভগবন্, স্ত্রীখল্বীয়ং।

সমস্তক জৃম্ভকাস্ত্র সমূহ প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, রাক্ষস-দূতকে আর অধিকক্ষণ আশ্বস্ত করিয়া রাখা অনাবশ্যক। তাঁহার আদেশ ক্রমে সীতা-বিবাহের পণ স্বরূপ হরধনু আনীত হইল। রামচন্দ্র অবলীলা ক্রমে তাহা বিখণ্ডিত করিলেন। রাক্ষস-দূতের সমক্ষেই কুশধ্বজ সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তিও, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নীত্বে বৃতা হইলেন। এমন সময় তাড়কা-নন্দন মারীচ, সুবাহুকে সঙ্গে লইয়া বৈর নির্য্যাতন মানসে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাক্ষস-দূতও আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া প্রভুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। এইরূপ বীর-চরিতের প্রথমাঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল।

ভবভূতি বীরচরিতের প্রথমাঙ্কে আদিকাণ্ডের প্রায় সমস্তই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বহুবর্ষের ঘটনা তাঁহাকে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে সীতার সহিত সাক্ষাৎ, অহল্যার শাপ-মুক্তি, তাড়কা বধ, হরধনুর্ভঙ্গ ও সুবাহু নিধন, সমস্তই একদিনের ঘটনা রূপে বর্ণন করিতে হইয়াছে। রাশীকৃত পদার্থ এক স্থানে সমাবেশ করিলে যেমন তাহা সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রক্ষা করা দুরূহ বোধ হয়, তেমনি তিনি উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত ঘটনা-রাশির সমবায়ে প্রস্তাবিত বিষয় জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। অঙ্কের আরম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে, বিশ্বামিত্রের পবিত্র আশ্রমে রামচন্দ্র ও সীতা পরস্পরকে সন্দর্শন করিলেন। সে আশ্রম অতি সুন্দর, কৌশিকী নদী তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ধীর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। নিরন্তর শ্যাম-শোভায় অলঙ্কৃত অরণ্যানী, তাহার প্রান্তভাগ হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। সেই রমণীয় স্থানে রাম ও সীতা পরস্পরকে সন্দর্শন করিলেন। উভয়ের সৌন্দর্য্যে উভয়ে বিমোহিত হইলেন। কিন্তু সেই অনুরাগ যাহাতে আরও বদ্ধমূল হইতে পারে, কবি তৎজন্য রামচন্দ্রের করুণার ও সর্ব্ব ভূতানুকম্পার নিদর্শন স্বরূপ, অহল্যার শাপ মুক্তির প্রচার করিলেন। কিন্তু কেবল করুণায় ত ক্ষত্রিয়-তনয়ার হৃদয় মোহিত থাকিবার নয়, বীর-দুহিতা, বীর পতিলাভের জন্যই অভিলাষিণী হইয়া থাকেন। হর কার্ম্মুক ভঙ্গ যাহার বিবাহের পণ স্বরূপ, যিনি জন্মাবধিই শুনিয়া আসিতেছিলেন যে, কোন অদ্বিতীয় বীর পুরুষ ভিন্ন অপর কেহই তাহার পাণি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না, তাহার হৃদয় যে বীরত্বের পক্ষপাতিনী হইবে, ইহাতো নিতান্তই যুক্তিসঙ্গত কথা। বীর বালিকা স্বভাবতই বীরত্বের অনুরাগিণী হইয়া থাকেন। মহাকবি সেই জন্যই সঙ্গে সঙ্গে তাড়কাবধ, জৃম্ভকাস্ত্র লাভ এবং সুবাহু পরাজয় এই কয়টী ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের কমনীয় আকৃতি দর্শনে সীতার হৃদয়ে প্রথমে যে অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, অহল্যার মুক্তিলাভে তাহা বদ্ধমূল হইল এবং অবশেষে হরকার্ম্মুক ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। পাশ্চাত্য-কবিগণ, বীরত্বকেই স্ত্রীজাতির হৃদয় আকর্ষণ করিবার উপায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। অপ-

ভূতিও এবিষয়ে তাঁহাদিগের সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে অনুরাগের উৎপত্তি বাহ্য সৌন্দর্য্যে, তাহা দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য মানসিক সৌন্দর্য্যেরও প্রয়োজন।

রামচন্দ্র ও সীতার যে প্রণয়, সুখ দুঃখ, শৈশব যৌবন, সকল অবস্থাতেই অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা এইরূপে সমুৎপন্ন হইল। মহাকবি, যে প্রেমের পরিণাম উত্তরচরিতে বর্ণন করিবেন বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, বীর-চরিতের প্রথমাঙ্কে এই রূপে তাহার সূত্রপাত করিয়া রাখিলেন। যে বিশাল আগার তিনি ভবিষ্যৎ কালে নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তিভূমি এই রূপে নির্ম্মিত হইল। এই বার আমরা বীরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্কের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভবভূতি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বীর-চরিত ও উত্তরচরিত প্রণয়ন করিলেও, সকল স্থলে বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নাই। বরঞ্চ স্থানে স্থানে তাহার প্রতিবাদই করিয়াছেন। বিশ্বামিত্রাশ্রমে রাম ও সীতার পরস্পরকে সন্দর্শন,সম্পূর্ণ রূপেই ভবভূতির নিজের সৃষ্টি। যাহা রামায়ণের বর্ষব্যাপিনী ঘটনা, তিনি তাহা একই দিনের কার্য্য বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বীরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্কে, তাঁহার স্বতন্ত্রতা এবং মৌলিকতা যেরূপ সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হইবে, তেমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বাল্মীকি স্বপ্রণীত গ্রন্থে রাক্ষসরাজ রাবণের মাতামহ মাল্যবানের নাম মাত্রই করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের মাল্যবান একজন অতি সামান্য, নিম্নশ্রেণীর প্রকৃতি। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বস্তুর উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা সাধনে, তাঁহার প্রভুত্ব অতি অল্প। প্রভুর হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলীর ন্যায় তিনি তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী। প্রতিবাদ করিবার শক্তি নাই; কেবল অন্ধের ন্যায় অনুসরণই তাঁহার কার্য্য। কিন্তু বীরচরিতের মাল্যবান রামায়ণের মাল্যবান হইতে সম্পূর্ণ রূপেই স্বতন্ত্র। জামদগ্ন্যপরাভব, সীতাহরণ এবং লঙ্কাজয় এ সকল তাঁহার গূঢ় মন্ত্রণার ফল। তিনি এক জন প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ। রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ গণনায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কিন্তু রাবণের দুর্ভাগ্য ক্রমে, ও অদৃষ্টচক্রের অখণ্ডনীয় নিয়মে তাঁহার সমস্ত মন্ত্রণা নিষ্ফল হইল। বহু চিন্তায় ও বহু যত্নে তিনি প্রভুর মঙ্গলের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সকলই তাঁহার অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু কৃতকার্য্য না হইলেও মাল্যবান একজন রাজনীতিজ্ঞ। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরল উপায় অবলম্বন করিলে, হয়ত তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু কবে কোন্ রাজনীতিজ্ঞ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজ উপায় গ্রহণ করিয়া থাকেন?

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, মাল্যবান চিন্তামগ্ন। সে চিন্তা রাজ্যের অমঙ্গল পরিহারের জন্য নয়, তাহা রামচন্দ্রের অলৌকিক প্রভাবাসহিষ্ণুতা হইতে উদ্ভূত। মাল্যবান ভাবিতেছিলেন;—

"দুরাদ্দবীয়ো ধরণীধরাভং
যস্তাড়কেয়ং তৃণবদ্ব্যধূনোৎ

হত্বা সুবাহোরবি তারকারিঃ
সরাজপুত্রোহদ্বিরায়তেমে।"

ক্ষত্রিয়কুমারের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, পর্ব্বতের ন্যায় সেই তাড়কাপুত্রকে একটা তৃণের মত দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার কথা ভাবিতে গেলেও আমার হৃদয় যেন ব্যথিত হয়ে যায়।

মাল্যবান একজন রাজনীতিজ্ঞ। কবে কোন্ রাজনীতিজ্ঞ অকুষ্ঠিত চিত্তে শত্রুর প্রভাব সহ্য করিতে পারে? তিনি শত্রুর বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আপনাদিগের তেজের হ্রাস আশঙ্কা করিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন যে, বিশ্বামিত্র অমোঘ দিব্যাস্ত্র সমূহ রামচন্দ্রকে দান করিয়াছেন। প্রবল পরাক্রান্ত সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। দেবতারাও রামচন্দ্রের পক্ষপাতী। তাঁহারা ও দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা আপনাদিগের অনুকূলতা প্রকাশ করিয়াছেন। এ সকলই ত চিন্তার কথা "সর্ব্বং প্রায়ো ভজতি বিকৃতিং ভিদ্যমানে প্রতাপে" দুঃখের দিন আসিলে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়।

মাল্যবান ভাবিতেছিলেন, তবেত আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয়। এমন সময় সূর্পণখা আসিয়া বলিল, "ঠাকুদ্দাদা, আর দেখেন কি? রামসীতার বিবাহ হয়ে গিয়েছে, আবার অগস্ত্য ঋষি, সেই ইন্দ্রের ধনুখানাও রামের জন্ত পাঠিয়ে দেছেন।" মাল্যবান দেখিলেন যে, বিবাদ আরও ঘনীভূত। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুলিও ক্রমে ক্রমে রামের নিকট একত্রিত হইতেছে। তবে এই সময় হইতেই রামকে দমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হঠাৎ স্বয়ং রামের সহিত প্রতিযোগীতা না করিয়া শত্রুর দ্বারা শত্রু নিরস্ত করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। কিন্তু জগতে রামচন্দ্রের প্রতিযোগী যোদ্ধা কোথায়? শেষে মাতামহ দৌহিত্রী, উভয়ে অনেক পরামর্শের পর স্থির করিলেন যে, জামদগ্ন্যই জগতের মধ্যে রামচন্দ্রের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। যদি কোন কারণে তাঁহাকে রামের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে আর বড় উদ্বেগের বিষয় থাকে না। সে কারণেরও বড় অভাব ছিল না। রামচন্দ্র হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কবে কোন্ ভক্তিপরায়ন শিষ্য গুরুর অপমান সহ্য করিতে পারে? শেষ পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, হরধনুর্ভঙ্গ লইয়া রামচন্দ্র ও জামদগ্ন্যের সঙ্গে বিবাদ উত্থাপন করাইতে হইবে। উভয়ে সেই উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র দ্বীপে জামদগ্ন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য পরিসমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য অতি গম্ভীর ও অতি কঠোর। ইহার নায়ক রামচন্দ্র ও ভগবান ভার্গব। একদিকে যেমনই কারুণ্য ও কোমলতার প্রাধান্য, অন্য দিকে তেমনই ভীষণ কর্কশ স্বভাবের পরাকাষ্ঠা। পাঠ করিলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। ক্রমশঃ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ ?

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রপঞ্চের অন্তরালে যে এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি বিদ্যমান, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রচলিত ধর্ম্মমত সকলের সমুদায় সত্য যাহারা উড়াইয়া দিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি ও স্বরূপকে যাঁহারা মানবের অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মহাশক্তির বিদ্যমানতা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের *Nineteenth Century* নামক মাসিক পত্রিকাতে হার্বার্ট স্পেনসার এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহার উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"There is an Infinite and Eternal Energy from which every thing proceeds."

"অর্থ—জগত মধ্যে এক অনন্ত ও অবিনাশী শক্তি আছে, যাহা হইতে চরাচর বিশ্ব নিঃসৃত হইয়াছে।" জন ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রণীত Three Essays on Religion নামক গ্রন্থে প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন:—

"It would seem then that, in the only sense in which experience supports in any shape the doctrine of a First Cause—viz, as the primœval and universal element in all causes, the First Cause can be no other than Force"—Mill's Essay on Theism.

অর্থ।—"কারণ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে এবং কারণ শব্দের অর্থ আমরা যাহা বুঝিয়াছি, অর্থাৎ সমুদায় কারণের আদি ও সর্ব্বব্যাপী কারণ রূপে যাহা বিদ্যমান, সেই অর্থে, শক্তি ভিন্ন আর কিছুকেই কারণ বলিতে পারা যায় না।"

উক্ত উভয় পণ্ডিতের মতেই এক অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তি হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে। কেবল তাহাও নহে, এই আদ্যাশক্তি, এক, অনন্ত ও অবিনাশী। প্রথম প্রশ্ন এই—এই শক্তি যে এক, তাহার প্রমাণ কি? কে বলিল, এই ব্রহ্মাণ্ড দুই বা তদধিক শক্তির সংঘর্ষে উৎপন্ন হয় নাই? ইহার উত্তর জন ষ্টুয়ার্ট মিল উক্ত গ্রন্থে দিয়াছেন।

"The force itself is essentially one and the same; and there exists of it in nature a fixed quantity, which is never increased or diminished."

অর্থ—"এই শক্তি মূলে এক ও অভিন্ন, এবং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আছে, যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই।"

এই শক্তি এক ও অক্ষয় এবং ইহা হইতেই বিশ্বের সকল কার্য্য হইতেছে, সুতরাং ইহা সর্ব্বব্যাপী। তবে এই মহা পণ্ডিতদিগের সাহায্যে আমরা এই টুকু সত্যে উপনীত হইতেছি যে বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান, যাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অবিনাশী ও অনন্ত।

কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতি কি? মিলের কথার ভাবে বোধ হয়, তিনি এই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জড়শক্তি বলিয়া অনুভব করেন; যেমন তাড়িত বা ম্যাগ্‌নেটিজম্, শক্তি বটে, কিন্তু অন্ধ জড়শক্তি মাত্র, সেই রূপ এই আদি শক্তিও অন্ধ জড় শক্তিমাত্র। স্পেনসার বলেন, এই শক্তির স্বরূপ অপরিজ্ঞেয়, অথচ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত মাসিক পত্রিকার পরবর্ত্তী এক সংখ্যায়

স্বীকার করিয়াছেন যে, মানবচৈতন্যেও এই শক্তির প্রকাশ—"it wells up in consciousness"—"এই শক্তি মানবের চিৎ-শক্তি মধ্যে উৎসারিত হইতেছে"। আরও একস্থানে বলিয়াছেন—"Some thing more than consciousness" অর্থাৎ চিৎ-শক্তি বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এই শক্তি তাহা অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু তাহা অ-পেক্ষা অধিক।

এখন একবার বিচার করিতে হইবে যে, এই আদ্যাশক্তির বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু জানিতে পারা যায় কি না? স্পেনসারের যে উক্তিটী সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, চরাচর বিশ্ব এই মহাশক্তি হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই মহাশক্তি সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু ইহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তিল হইতে যেমন তৈল নিঃসৃত হয়, জল হইতে যেরূপ বাষ্প নিঃসৃত হয়, সেইরূপ জগৎ এই শক্তিরই বিবর্ত্তিত স্বরূপ মাত্র। এখন প্রশ্ন এই, মানবের চিৎশক্তি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? মানবাত্মা কি আশ্চর্য্য বস্তু! কি গভীর প্রহেলিকা! এই অদ্ভুত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন চৈতন্য কোথা হইতে সৃষ্টি-রাজ্যে দেখা দিল? আবার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এই জগতের অবস্থা এক কালে উষ্ণ বাষ্পাকার ছিল এবং তখন সেই উষ্ণ বাষ্পরাশির মধ্যে মানব চৈতন্য দূরে থাকুক, কোন প্রকার জীবাঙ্কুরেরও থাকা সম্ভব ছিল না। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের এক স্থলে মিল বলিয়াছেন:—"There is a vast amount of evidence that the state of our planet was once such as to be incompatible with animal life, and that human life is of very much more modern than animal life"—Essay on Theism.

অর্থ।—"ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে যে, আমাদের এই পৃথিবীর অবস্থা এককালে এমন ছিল যে, ইহা কোন জীবের জীবন রক্ষার উপযোগী ছিলনা, এবং মানব জীবন অপর জীবনের অনেক পরে উদ্ভূত হইয়াছে।"

Encyclopedea Britanica নামক গ্রন্থে সুবিখ্যাত Huxley হাক্সলি সাহেব (Biology) অর্থাৎ জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার একস্থানে বলিয়াছেন;—

"The condition of the globe was at one time such, that living matter could not have existed in it, life being entirely incompatible with the gaseous state."—

অর্থ।—"পৃথিবীর অবস্থা এককালে এরূপ ছিল, তখন কোন জীবিত প্রাণীর ইহাতে বাস করা অসম্ভব ছিল; কারণ বাষ্পাবস্থায় ইহা কোন প্রকার জীবের স্থিতির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল।"

তবেই দেখা যাইতেছে, এই ধরণী এক কালে তরল উষ্ণ বাষ্পময় ও জীবন ধারণের অনুপযোগী ছিল, তখন ইহাতে বিচিত্র শক্তিময় মানবাত্মা দূরে থাকুক, জীবের জীবনও ছিল না। ধরাধামে জীবন ছিল না, জীবন আসিয়াছে; কোথা হইতে আসিয়াছে? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উত্তর—জীবন জড়েরই পরিণতি মাত্র; দ্বিতীয় উত্তর—ইহা কোন চেতনময় পুরুষ হইতে সংক্রান্ত? দেখা যাউক, প্রথম উত্তরটী কতদূর যুক্তি-যুক্ত, ইহা সপ্রমাণ হয় কি না? যদি বলা হয়, জড় হইতেই জীবনের উৎপত্তি, তাহা

হইলে এই বলা হইল, অচেতন শক্তি চেতনকে প্রসব করিয়াছে। ইহা কিরূপে হইল? পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে হাক্সলি (Huxley) বলিয়াছেন;—

"The properties of living matter distinguish it absolutely from all other kinds of things; and the *present state of knowledge furnishes us with no link between the living and the not-living.*"

অর্থ।—"সজীব পদার্থের গুণাবলী তাহাকে অপর সমুদায় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকার করিয়াছে; আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থাতে, কিরূপে যে জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হইল, তাহা আমরা জানি না।"

উক্ত প্রবন্ধের আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন;—

"Of the causes which have led to the origination of living matter, it may be said, that we know absolutely nothing."

অর্থ।—"কি প্রণালীতে এ জগতে সজীব প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, আমরা কিছুই জানি না।"

তবুও যদি পাঠক মহাশয় বলেন যে, জড় হইতেই চৈতন্য উৎপত্তি হইয়াছে, তবে বিবর্ত্তবাদের একটী মূল নিয়ম স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সেটী আমাদের দেশে ন্যায় শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে। নিয়মটী এই; কার্য্যের গুণাবলী কারণের গুণাবলীর অনুসারী হইয়া থাকে। মনে করুন, জল, তেজ, প্রভৃতি পদার্থের সমবায়ে বাষ্পের উৎপত্তি হইয়াছে। বাষ্পে এমন কিছু থাকিতে পারে না, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ সকলে কোন না কোন আকারে বিদ্যমান ছিল না। এই যুক্তির অনুসারে এক জন প্রশ্ন করিতে পারেন যে, চৈতন্য যদি কোন আকারে সেই আদি শক্তিতে বিদ্যমান ছিল না, তবে কোথা হইতে সৃষ্টি মধ্যে আবির্ভূত হইল? জনষ্টুয়ার্ট মিল ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, অতি কদর্য্য মৃত্তিকা হইতে যেমন চমৎকার উদ্ভিদ ও পুষ্পাদি উৎপন্ন হয়, সেই রূপ স্থূল জড় হইতে সূক্ষ্ম চেতন উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে বিচিত্র কি? ফুল মৃত্তিকার পরিণতি কিন্তু কোথায় মলিন মৃত্তিকা আর কোথায় নির্ম্মল ফুল; সেইরূপ জড় হইতে বিসদৃশ পদার্থ যে চেতন, তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। মিল মহাশয়ের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে আমাদিগকে নিরুত্তর করিতে পারিতেছে না। আমরা জিজ্ঞাসা করিব, ফুলের মধ্যে এমন কি গুণ আছে, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পরম্পরার মধ্যে অবস্থিত ছিল না? পুষ্পের নয়ন-তৃপ্তিকর বর্ণ সূর্য্য-রশ্মিতে ছিল, কোমলতা জলীয় পরমাণুতে বিদ্যমান ছিল, সুগন্ধ পৃথিবীতে ছিল। সেই রূপ কি এই কথা বলিবে যে, মানবাত্মার চিৎশক্তি সেই আদি কারণভূত মহাশক্তি মধ্যে বর্ত্তমান ছিল? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, কার্য্যের গুণ যে, সকল স্থানেই কারণের গুণানুসারী হয়, তাহা নহে। চুণ ও হরিদ্রা, এই উভয়ের কেহই লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট নহে, অথচ উভয়ের সংযোগে রক্ত বর্ণের আবির্ভাব হয়। অথবা দশ খানি দ্রব্য মিলাইয়া ঔষধ প্রস্তুত হইল, তাহাদের কোন একটীর পিত্তঘ্নতা নাই কিন্তু দশখানি মিলিত হইলে পিত্তঘ্নতা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে যেমন দেখিতেছি যে, কার্য্যে এমন গুণের আবির্ভাব হইতেছে যাহা কারণীভূত পদার্থ নিচয়ের

মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না; সেই রূপ কেন বল না যে, চৈতন্য এই দেহের নিদানভূত ধাতু সকলের মধ্যে কোন একটীতে ব্যষ্টি-ভাবে না থাকিলেও সমষ্টিভাবে তাহাদের সংযোগ-সিদ্ধ দেহ-পিণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছে? ইহা উপমা মাত্র হইল, প্রমাণ হইল না। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা এই মাত্র বলা হইল যে, যে প্রণালীতে চূণ হরিদ্রার সংযোগে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি, সেই রূপ কোন প্রণালীতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহাকে প্রমাণ বলে না। মনে কর, যে ব্যক্তি সেই লোহিত বর্ণ পদার্থটী দেখিয়া বলিতেছে যে, ইহা চূণ ও হরিদ্রার সংযোগে সমুৎপন্ন, সে তাহা নানা প্রকারে প্রমাণ করিতে পারে। (১ম) সেই সংযোগ-জাত পদার্থটীকে রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া চূণ ও হরিদ্রা স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতে পারে (২) সে চূণ ও হরিদ্রাকে মিশ্রিত করিয়া সেই যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে পারে (৩য়) সে চূণ ও হরিদ্রা উভয়ের মধ্যে এমন গুণ সকল আবিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারে, যাহার সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণ হইবার কথা। যিনি বলিতেছেন যে, জড় হইতেই চৈতন্যের আবির্ভাব, তাঁহার নিকটে আমরা এরূপ কোন প্রমাণ চাই; কারণ যে মাত্র তিনি বলিলেন যে, ইহাতে জড়ের অতিরিক্ত কিছু নাই, তদণ্ডেই তাঁহার উপর আমাদের এই দাওয়া জন্মিল যে, আমরা তাঁহার নিকট অপর জড় পদার্থের পরীক্ষার প্রমাণের ন্যায় প্রমাণ চাহিব; সেরূপ প্রমাণ না দিতে পারিলে তাঁহার উক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি হয় জড়কে অবলম্বন করিয়া চেতন উৎপন্ন করুন, (২য়) না হয় চেতনকে বিশ্লেষণ করিয়া জড়কে প্রদর্শন করুন (৩য়) না হয় রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে বলিয়া দিন, দেহের কোন কোন ধাতুকে কি কি পরিমাণে সংযুক্ত করিলে চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে। ইহার কোন প্রমাণ তিনি যদি দিতে না পারেন, তবে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি, দম্ভপূর্ব্বক একথা প্রচার না করিয়া হাক্সলির ন্যায় বিনয়ের সহিত বলুন;—"কিরূপে জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব হইল, তাহার কিছুই জানি না; তবে বোধ হয় যে প্রণালীতে চূণ হরিদ্রার সংমিশ্রণে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন প্রণালীতে হইয়া থাকিবে।" ভবিতব্যতার অনেক দ্বার; এরূপ হইতে পারে, আর এক প্রকারও হইতে পারে। "এরূপ হইলেও হইতে পারে" এ প্রকার মনের ভাবকে প্রমাণ কহে না। অতএব জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি—একথা অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই।

জড় হইতে চেতন একথা যদি প্রমাণিত হইল না, তখন চেতন হইতে চেতন একথাই অধিক বিশ্বাস্য। কারণ কার্য্য-গুণ কারণ-গুণের অনুসারী হয়। এতদ্দ্বারাও হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সেই আদ্যাশক্তি চিন্ময়ী; এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্য-বর্ত্তিনী শক্তি চিন্ময়ী, ইহার অর্থ এই যে, এই সৃষ্টি যেরূপেই উৎপন্ন হউক না কেন, সজ্ঞানে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ সেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এই পরাশক্তির জ্ঞানের অন্তর্গত ছিল। আরও বহুতর প্রমাণ দ্বারা ইহা স্বীকৃত হয় যে, এই বিশ্বের অন্তরালে যিনিই থাকুন, চিৎশক্তি ও জ্ঞানক্রিয়া তাঁহার ধর্ম্ম। উপনিষদ কহিয়াছেন;—

পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভা-

বিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ"। ইহাঁর শক্তি মহৎ ও বিচিত্র এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বাভাবিক’

শিশুর স্তন-পানরূপ ক্রিয়াটীর বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। এ ক্রিয়াটী কেমন আশ্চর্য্য!!! এতদ্দ্বারা একটী সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে অথচ সে বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান নাই, আবার কিরূপে সে ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহার উপদেশ নাই; অথচ সুচারুরূপে সেই ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হইতেছে। এই ক্রিয়াটী অন্যান্য ক্রিয়া হইতে কিরূপ বিভিন্ন! শিশুর জ্ঞান নাই, অভ্যাস নাই, শিক্ষা নাই, উপদেশ নাই, অথচ এমন একটী ক্রিয়া করিতেছে, যদ্দ্বারা একটী সুমহৎ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয়না যে, সেই উদ্দেশ্য জ্ঞান ও সেই মঙ্গল অভিসন্ধি ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই মহাশক্তিতেই আছে? মানব শিশুতে যেমন জ্ঞান নাই, অথচ আশ্চর্য্য জ্ঞান ক্রিয়া দৃষ্ট হইতেছে, পশু পক্ষীর ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করিলেও এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা এমন সকল কার্য্য করে, যাহার তাৎপর্য্য তাহারা জানে না, এবং কোন বুদ্ধিমান জীব করিলে তাহার আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়, অথচ তন্মূলে তাহাদের বিচার শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষিদিগের কুলায় নির্ম্মাণ, মধুমক্ষিকার মধু সঞ্চয়, বোলতা প্রভৃতির খাদ্যাহরণ কার্য্য এই শ্রেণী গণ্য। ভেকদিগের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া এই সকল স্বাভাবিক ক্রিয়ার অনেক আশ্চর্য্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভেককে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেই দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় মস্তক বিহীন শরীরার্দ্ধ—যখন পড়িয়া আছে, তখন তাহার এক খানি পায়ে যদি এক বিন্দু এসিড্ ফেলিয়া দেওয়া যায়, তখন আর এক খানি পা দিয়া সেই এসিড্ বিন্দু মুছিবার জন্য বার বার প্রয়াস পাইতে থাকে। এই ক্রিয়ার প্রকৃতি কি আশ্চর্য্য! এ কার্য্যে যে তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার প্রমাণ ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এখানেও দেখিতেছি, অজ্ঞতা সহকারে এমন একটী কার্য্য হইতেছে, যাহার মধ্যে একটী মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত। ইহা দেখিয়া পাঠকগণ কি বলিবেন? যে জ্ঞান ভেকে নাই অথচ কার্য্যে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সে জ্ঞান কোথায়? শুনুন এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ মিভার্ট এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? বিগত এপ্রিল মাসের Fortnightly Review পত্রিকাতে তিনি লিখিয়াছেন:—" For myself I am bound humbly to confess that the more I study nature, the more I am convinced that in the action of this all-pervading but inscrutable and unimaginable intelligence, of which self conscious human rationality is the utterly inadequate image attainable by us, is to be sought the possible explanation of the mysterious but undeniable presence in Nature of a rationality in that which is in itself irational."

অর্থ—"আমার কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার নিকট আমি বিনয় সহকারে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমি যতই প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিতেছি, ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে, সেই সর্ব্বব্যাপী, অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় পরম জ্ঞানকে—আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন মানবীয়

জ্ঞান যাহার ছায়ামাত্র,—অথচ (এই যানা জ্ঞান ভিন্ন সে জ্ঞানের অন্য প্রতিকৃতি আমাদের পাইবার উপায় নাই) স্বীকার করা ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে বিচার বিহীন ও জ্ঞান বিবর্জ্জিত প্রাণিতে জ্ঞান ক্রিয়া দর্শনরূপ অত্যাশ্চর্য্য সমস্যার সদুত্তর হইবার উপায়ান্তর নাই।"

সেই আদ্যা শক্তি যে জ্ঞানশালিনী, আর একটী যুক্তির দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়—তাহা সৃষ্টিকৌশল দর্শনে স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয়। এ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত গ্রন্থে ও এই পত্রিকারই প্রবন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমি সে সকল দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করিয়া পাঠকগণের সময় নষ্ট করিব না। তবে এ বিষয়ে দুই একটী বড় লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া নিবৃত্ত হইব। সুবিখ্যাত ডারুইন সাহেবের Fertilization of Orchids নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া একটী কথা বলিয়াছেন। সে ঘটনাটী এই ;—পতঙ্গগণ যখন মধুপান করিবার জন্য পুষ্পে আসে, তখন দেখা যায় যে পুষ্পের গঠনের মধ্যে এমন চাতুরী আছে যে, তাহারা সহসা মধুপান করিতে পারে না, মধুর নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। ইত্যবসরে তাহাদের চরণস্থ পরাগরেণু গর্ভরেণুর সহিত মিলিয়া যায়। মধুপানে যে বিলম্ব হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া ডারুইন বলিয়াছেন ;—"If this is accidental, it is a fortunate accident for the plant. If this be not accidental, *and I cannot believe it to be accidental*, what a Singular case of adaptation!"

অর্থ।—"এই ঘটনাকে যদি আকস্মিক বল তবে ইহা এমন আকস্মিক যাহা উক্ত পুষ্পের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি আকস্মিক না হয়—আমি ইহাকে আকস্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না—তাহা হইলে ইহাতে কি আশ্চর্য্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে!"

জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থের একস্থলে বলিয়াছেন ;—

"I think it must be allowed that in the present state of our knowledge, the adaptations in Nature afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence."

অর্থ।—"আমার বোধ হয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া, ইহা খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে, জ্ঞানদ্বারাই এই সৃষ্টি হইয়াছে।"

বিশ্বের আদি কারণে যে কেবল জ্ঞান আছে তাহা নহে, তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বশক্তি অথবা ক্রিয়েচ্ছাও আছে। ইহার প্রথম যুক্তি এই যে, আমাদের আত্ম নিহিত ক্রিয়েচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন শক্তির জ্ঞান আমাদের নাই। এবিষয়ে একটী প্রশ্ন আছে; আমরা জগতের কার্য্য পরম্পরা দেখিয়া যে শক্তির অনুমান করিতেছি, সে শক্তি জ্ঞানের মূল কোথায়? যদি কোন স্থানে কার্য্যের পশ্চাতে, গতির অন্তরালে, চেষ্টার প্রারম্ভে শক্তিকে বিদ্যমান না দেখিয়া থাকি, তবে আর একস্থলে কার্য্য বা গতিকে দেখিয়া শক্তির চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইবে কেন? তাহা কি স্বাভাবিক? মনে কর, এক ব্যক্তি জীবনের মধ্যে একটী দিনও অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখে নাই, সে কি এক দিন পর্ব্বত পৃষ্ঠে হঠাৎ ধূমের সঞ্চার দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে পারে? পর্ব্বতে ধূম আছে,

অতএব বহ্নিও আছে, ইহা যে ব্যক্তি বলিতেছে, সে ইহাও সেই সঙ্গে বলিতেছে যে, সে জানে ধূম বহ্নি হইতেই নির্গত হয়। অর্থাৎ ধূমের পশ্চাতে বহ্নি থাকে। সেই রূপ যে ব্যক্তি কখনও দেখে নাই যে, শক্তি হইতে গতির উৎপত্তি হয়, সে কি ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তনশীল ঘটনারাজি দেখিয়া শক্তির অনুমান করিতে পারে? তবেই এক ব্যক্তি যখন এই বিশ্বের কার্য্য সকল দেখিয়া বলিতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই এক মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন; সে সেই সঙ্গে ইহাও বলিতেছে যে, সে নিজে শক্তি হইতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছে। সে কোথায় ইহা দেখিল? এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক্তির প্রথম পরিচয় আমাদের অন্তরে। আমরা যখন অঙ্গ সঞ্চালন করি, যখন কোন দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করি, তখন আমরা কোন্ জাতীয় শক্তির পরিচয় পাই? আমরা হস্ত দ্বারা একটী ভারি বস্তু স্থানান্তরে রাখিতেছি, এখানে সেই কার্য্যের প্রেরক কে? হস্তের মাংসপেশী সমুদায় অথবা তদন্তরালবর্ত্তী আর কোন ও শক্তি? এমন অবিবেচক কে আছে যে বলিবে যে, মাংসপেশী-সকল সেই কার্য্যের প্রেরক। সেখানে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের ইচ্ছাই কার্য্যের প্রেরক। সেই ইচ্ছারূপিনী শক্তিই হস্তকে প্রেরণ করিতেছে এবং তাহা হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের শক্তি-জ্ঞানের মূল এই খানে। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে শক্তির অনুমান করিতেছি, তাহা এই শক্তি-জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। স্পেনসারও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রণীত First Principles নামক গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন;—

"No force save that, of which we are conscious during our own muscular efforts is immediately known to us" while "all other force is mediately known."

অর্থ।—"আমাদের অঙ্গচালনা কালে আমরা যে শক্তি অনুভব করি, তদ্ব্যতীত অন্য কোন শক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞান আমাদের নাই, এতদ্ভিন্ন যে কোন শক্তির জ্ঞান আছে, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে কিন্তু অনুমান-লব্ধ জ্ঞান মাত্র।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমরা যাহাকে শক্তি বলি, তাহার মূলে মানসিক বলেরই জ্ঞান। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিদ্যমান—এই সত্য উচ্চারণ করিলে আমরা যদি তাহা মনে ধারণ করিতে যাই, তাহা হইলে সেই শক্তিকে ক্রিয়েচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বলরূপে ধারণা করিতে পারি না। অতএব যে যুক্তি আমাদিগকে এই মহাশক্তির সত্তাতে উপনীত করে, সেই যুক্তিই আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, এই শক্তি মানসিক শক্তি বা ক্রিয়েচ্ছা (will)।

দ্বিতীয় যুক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আমাদিগের শারীরিক ক্রিয়া গুলির বিষয় এক বার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেই মানবদেহে চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। (১ম) ইচ্ছা প্রসূত ক্রিয়া, (২য়) স্বভাবজাত ক্রিয়া (৩য়) অভ্যাস জাত-ক্রিয়া (৪র্থ) ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া।

(১ম) বিশেষ ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান সহকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা ইচ্ছাপ্রসূত ক্রিয়া—যেমন একটী প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ তুলিবার জন্য হস্ত

প্রসারণ করি। ইহাতে আমাদের সুখস্পৃহা উত্তেজক, জ্ঞান পথপ্রদর্শক, ও প্রবৃত্তি কার্য্যের পরিচালক।

(২য়) এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা মানব কখনও শিক্ষা করে নাই, কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ পায় নাই, অথচ বিশেষ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য স্বভাবতই তাহা করে—তাহা স্বভাবজাত ক্রিয়া; যথা, শিশুর স্তন পান। স্তন পানরূপ ক্রিয়াটীতে বিশেষ কৌশল আছে। যেরূপে টানিয়ে দুগ্ধ পাওয়া যায়, সেরূপ করিয়া টানা এক জন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কর, অথচ শিশু জননীর গর্ভ হইতে পড়িয়াই, বিনা শিক্ষায় ও বিনা উপদেশে সুন্দররূপে জননীর চুচুক মুখে লইয়া টানিয়া থাকে। ইহা পুষ্প চয়নার্থ হস্ত প্রসারণের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি বিচার পূর্ব্বক ক্রিয়া নয়, অথচ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ন্যায় ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়াও নয়। ইহাতে ইচ্ছার যোগ আছে অথচ জ্ঞানের যোগ নাই।

(৩য়) আর এক প্রকার ক্রিয়া, যাহার মূলে এক সময়ে ইচ্ছা ও জ্ঞানের যোগ ছিল, কিন্তু অভ্যাস বশত সে যোগ আর এখন লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। তাহা অভ্যাস জাত ক্রিয়া। যথা গমনার্থ পদবিক্ষেপ। আমরা গমনার্থ পদবিক্ষেপ করি, কিন্তু প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি আমাদের জ্ঞান থাকে যে, পদবিক্ষেপ করিতেছি, এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপের সময় কি ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান দেখা যায়? তাহা যায় না। আমাদের দৃষ্টি আকাশের নক্ষত্রে রহিয়াছে, আমাদের মন কোন নিগূঢ় প্রশ্নের মীমাংসাতে বিব্রত রহিয়াছে, অথচ আমরা যাইতেছি, পদদ্বয় উঠিতেছে ও পড়িতেছে, প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। যেন কলে কার্য্য চলিতেছে। এক সময়ে মনের কর্ত্তৃত্ব ছিল, এক সময়ে মনকে ভাবিতে হইয়াছিল, কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, কত ফিকির ফন্দী করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এখন সেই ক্রিয়া, কলের ক্রিয়ার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। একটী শিশু যখন প্রথম দাঁড়াইতে ও হাঁটিতে চেষ্টা করে, সেই সময়ের বিষয় একবার চিন্তা কর; তাহাকে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিয়া হাঁটিতে হয়, কিন্তু অভ্যাস বশত সেই ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। এরূপ শুনাও গিয়াছে যে, কোন কোন লোক হাঁটিতে হাঁটিতে ঘুমাইয়া থাকে।

(৪র্থ) যে শারীরিক ক্রিয়া আমাদের জ্ঞান বা ইচ্ছা নিরপেক্ষ হইয়া চলিতেছে, আমাদের ঘোর সুষুপ্তির অবস্থাতেও চলিয়া থাকে, তাহা চতুর্থ শ্রেণী গণ্য। যথা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, পাকস্থলীর ক্রিয়া, রক্তস্রোতের গতিবিধি ইত্যাদি। এ সকল ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার বহির্ভূত।

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ ক্রিয়াতেই আমরা কর্ত্তৃত্বশক্তি অথবা ক্রিয়েচ্ছার বিদ্যমানতা দেখিতেছি। শিশু সন্তানের স্তনপান স্থলে, যদিও সে ক্রিয়া অজ্ঞতাসহকৃত ও স্বভাব-প্রণোদিত ক্রিয়া, তথাপি তন্মধ্যে শিশুর চেষ্টা সুতরাং তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তিও আংশিকরূপে বিদ্যমান। সে মুখবিকাশ করিতেছে, হস্তদ্বয় প্রসারণ করিতেছে, স্তনদ্বয় ধরিতেছে, দুগ্ধ আকর্ষণ করিতেছে, এ সকল তাহার কার্য্য, সুতরাং এ সকলের অন্তরে তাহার ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেইরূপ অভ্যাস জনিত কার্য্য যেস্থলে হইতেছে, সেখানেও

অতি সূক্ষ্ম ও অলক্ষ্যভাবে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন কেমন করিয়া সেই পথিক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়াও ঠিক পথে যাইতেছে, পথের বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিতেছে, গো, মহিষ, শকট প্রভৃতির পথ পরিহার করিতেছে, যেখানে যেখানে মোড় ফিরিতে হইবে তাহা ফিরিতেছে? এতদ্দ্বারাই বোধ হয় যে,সে একটী চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন থাকিলেও অতি সূক্ষ্মরূপে তাহার দর্শন, শ্রবণ, বিচার প্রভৃতিও চলিয়াছে এবং তাহার ক্রিয়েচ্ছাও কার্য্য করিতেছে। এমন কি, নিদ্রিতাবস্থাতেও গমনের যে উল্লেখ করা হইয়াছে,সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যও অতি প্রচ্ছন্নভাবে পথের জ্ঞান রহিয়াছে, নতুবা সে ব্যক্তি বিপথে যাইতেছে না কেন? নিদ্রিতাবস্থাতে যে আমাদের এক প্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্তি জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা বিদ্যমান থাকে, তাহার আরও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সর্ব্বদা দেখা যায় যে, প্রাতঃকালে উঠিয়া যদি কোন স্থানে গমন করিবার কথা থাকে এবং এক ব্যক্তি সেই সংস্কার ও উৎকণ্ঠা লইয়া শয়ন করে, দেখিতে পাই, এক ঘুমের পর আপনা আপনি তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। ইহা কিরূপে হইল? নিদ্রার মধ্যেও তাহার মনে যদি বিচার ও বোধ শক্তি না থাকিবে, তবে সে কিরূপে ঠিক সময়ে জাগিল? এক বার এক খানি জাহাজ সমুদ্রে যাইতেছিল। যখন রাত্রি ১১ টা তখন তাহার কাপ্তেন নিদ্রা গেলেন, কিন্তু নিদ্রা যাইবার সময় দিঙ্‌নির্ণয় দ্বারা বুঝিলেন যে রাত্রি দুইটার পর জাহাজ খানি সমুদ্রের এক বিশেষ স্থানে উপস্থিত হইবে, যে সময়ে জাহাজের মুখ একটু ফিরাইয়া না দিলে একটা বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহা দেখিয়া তিনি প্রহরীদিগকে দুইটার সময় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া নিদ্রা গেলেন। ঘড়িতে ঠিক যখন দুইটা, প্রহরীগণ ডাকিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন শয্যাত্যাগ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং দেখেন যে ঠিক দুইটা বাজিয়াছে কিন্তু জাহাজ আশাতীত বেগের সহিত আসিয়াছে, এবং আর দশ মিনিট কাল তিনি নিদ্রিত থাকিলে সেই বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই বিপদ হইতে জাহাজ খানি বাঁচিয়া গেল। এখানেও দেখা গেল যে, গভীর নিদ্রার মধ্যেও বিচার ও বোধ শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতেছিল।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার মধ্যে ত্রিবিধ ক্রিয়াস্থলে আমরা ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্যপ্রবৃত্তির বিদ্যমানতা দেখিতেছি, কেবল যে সকল ক্রিয়াকে ইচ্ছা-বহির্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, যথা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া প্রভৃতি, তন্মধ্যেই মানবের ক্রিয়েচ্ছা দেখা যাইতেছে না। অথচ তদুপরি মানবের কর্তৃত্ব শক্তি না থাকায় অতি গূঢ় শুভ উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে। যে সকল ক্রিয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক নহে, যাহার অকরণে হঠাৎ জীবননাশের সম্ভাবনা নাই সে, সকল কার্য্য মানবের ক্রিয়েচ্ছার অধীন রহিয়াছে, কিন্তু এই কতকগুলি ক্রিয়া মানব দেহেই হইতেছে, এবং যাহা মানবের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ও যাহার অভাবে নিমেষ মধ্যে মানবের জীবননাশের সম্ভাবনা, সে গুলির উপরে মানবের কর্তৃত্ব নাই, তবে তদুপরি

কাহার কর্ত্তৃত্ব? ইহা কি মানবদেহের একটী আশ্চর্য্য তত্ত্ব নহে। এই বন্দোবস্তের প্রতি চিন্তাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিলে বিশ্বকারণে জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও ক্রিয়েচ্ছা তিনেরই কি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না?

তৃতীয় দৃষ্টান্ত প্রসূতির প্রসব বেদনা। একজন দেহ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেই পাঠক মহাশয় জানিতে পারিবেন যে, গর্ব্ভিণীর যখন প্রসব কাল উপস্থিত হয়, তখন কিয়ৎ কাল পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার বেদনা বাড়িতে থাকে। অবশেষে প্রসব সময়ে গর্ব্ভিণী গর্ব্ভস্থ ভ্রূণদেহের নিষ্ক্রামণোপযোগী এক প্রকার বেগ দিতে থাকেন। তাহাকে কোঁতপাড়া বলে। সহজ শরীরে মলত্যাগাদির সময়ে কাহাকেও যদি সেইরূপ কোঁতপাড়িতে হয়, তাহাতে কত পরিশ্রম ও কত বল প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ক্রিয়েচ্ছা বা কার্য্য প্রবৃত্তি যদি কোথাও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, তবে উক্ত শ্রমজনক ক্রিয়ার মধ্যে। অথচ প্রসূতি যখন ঐরূপ কোঁত পাড়েন, তখন তদুপরি তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শক্তি ও ক্রিয়েচ্ছার বহির্ভূত। যদি, তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে ক্লোরোফারম করিয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে হতচেতন করিয়া ফেলা যায়, তথাপি যথাকালে ঐ বেগ আপনি প্রকাশ পাইবে। এত বড় একটা বেগ ও বল প্রয়োগের কার্য্য হইতেছে, অথচ যে ব্যক্তির দ্বারা তাহা হইতেছে, তাহার সে বিষয়ে কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহাতে পাঠক মহাশয় কি বিবেচনা করেন? সে কার্য্য কাহার ইচ্ছাতে হইতেছে? সেই বেদনার সময় প্রসূতির উপরে উক্ত অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য করিবার ভার রাখিলে বিপদ ঘটিতে পারিত, এই জন্য বিশ্বকারণ আপনার হাতে সেই ভার রাখিয়াছেন, ইহা কি পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় না। ইহাও বিশ্বকারণে ক্রিয়েচ্ছা ও মঙ্গল ভাব বিদ্যমান থাকার অপর একটী প্রমাণ।

অতএব বিশ্বকারণে জ্ঞান আছে; এবং ক্রিয়েচ্ছা (will) আছে। কেবল তাহা নহে, প্রীতিও আছে। এই বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আসুন একবার চিন্তা করিয়া দেখি, প্রীতির সর্ব্ব প্রধান চিহ্ন কি? আমি সুখী হইলে যে সুখী হয় এবং আমাকে সুখী করিবার জন্য যে চেষ্টা করে, সেই আমাকে প্রীতি করে। ইহা সত্য কি না? যদি দেখি আমার কিছু লাভ হইয়াছে বলিয়া জগতের এত অসংখ্য মানবের মধ্যে দশটী লোক আনন্দ করিতেছে, এবং সেই দশজন যাহাতে আমার আরও লাভ হয় সেজন্য চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই দশজন আমার মিত্র অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে প্রীতি করেন। ইহা অতি সহজ কথা, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এখন পাঠক মহাশয় একটী সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল হস্তে লইয়া বিচার আরম্ভ করুন। যদি নিকটে গোলাপের বাগান থাকে, তবে বিশেষ অনুরোধ করি যে, ত্বরায় একটী গোলাপ তুলিয়া আবার এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আচ্ছা মনে করিয়া লই, তাঁহার হস্তে একটী গোলাপ রহিয়াছে। ঐ গোলাপটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। উহার পাপড়ীগুলি কেমন কোমল? উহার গন্ধ কেমন চিত্তের আনন্দদায়ক? উহার বর্ণ কেমন মনোমোহনকারী! এখন চিন্তা করুন, ঐ সুন্দর বর্ণ কেন

যে আমরা সুখে থাকি? এই প্রশ্ন আবার মনে উদয় হইতেছে। আর ইহাও কি সম্ভব যে, মানব হৃদয়ে এই প্রেমাগ্নি দেখিতেছি অথচ যে বিশ্বকারণ হইতে মানব হৃদয় সমুৎপন্ন, তাহাতে সেই প্রেমাগ্নি নাই? অতএব বলি বিশ্বকারণে যে কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়েচ্ছা আছে, তাহা নহে, প্রেম ও আছে।

কেবল তাহা নহে, তাঁহাতে আরও কিছু আছে। মানব প্রকৃতির আর একটা গূঢ় তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। মনে করুন, একজন লোকের সিন্ধুকের চাবিটী হারাইয়া গিয়াছে। তিনি প্রতিবেশী-দের বাড়ী হইতে অনেক গুলি চাবি আনাইয়াছেন; এক একটী করিয়া চাবী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। যে চাবিগুলি গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে কিন্তু লাগিতেছে না, তিনি এদিক ওদিক সেদিক করিয়া বার বার দেখিয়া শেষে বলিতেছেন, না এটা লাগিল না, এই বলিয়া সেটীকে পরিত্যাগ করিতেছেন। কিম্বা মনে করুন, এক ব্যক্তি শুনিয়াছিলেন যে, কোন একটী বিশেষ দ্রব্যে বমন নিবারণ করে। তিনি এক শত স্থলে সেইটী প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, বমন নিবারণ করে না। তৎপরে তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার শুনা কথা মিথ্যা। তিনি উক্ত দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। আর পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিল না। মানবের সকল কার্য্যেই এরূপ দেখা যায়; দশবার দেখিয়া যাহাতে বিফল হওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস থাকে না। সকলেই বলিবেন, ইহাই মানব-মনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একটী স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি আপনার চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতা লাভের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতেছেন। এই সংগ্রামের প্রকৃতি আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা ইহার মধ্যে তিনটী ভাব লক্ষ্য করি। (১ম) এই সংগ্রামে দুর্ব্বলতা বশত বার বার অকৃত-কার্য্য হইয়াও সাধুতা শ্রেষ্ঠ নয় বা সাধুতার জয় হইবে না, এরূপ বিশ্বাসে কেহ উপনীত হয় না—সে শতবার পড়িয়াও আশা করে। অন্যান্য স্থলে দশবার হারিলে নিরাশ হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের স্থলে শতবার হারিয়াও নিরাশ হইতেছে না। (২য়) সে যখন দুষ্প্রবৃত্তিদিগের বশবর্ত্তী হইয়া পতিত হইতেছে, তখনও পতিত হইতে হইতে ইহা অনুভব করে যে, ধর্ম্মেরই জয় যুক্ত হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ সে পাপের দাসত্ব করিতে করিতেও পুণ্যের মহত্ত্ব অনুভব করে। (৩য়) এই ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সে যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে, কখনও এরূপ অবস্থা অনুভব করে না যে, ধর্ম্মের উপরে উঠিয়াছে, তাহার লাভ করিবার আর কিছু নাই, বরং যে যত উর্দ্ধে উত্থান করে, সে তত মস্তকের উপরে ধর্ম্মকে উন্নত দেখিতে পায়। প্রথম দুইটী হইতে আমরা এই সত্যে উপনীত হই যে, ধর্ম্মের মহত্ত্বে বিশ্বাস মানবের স্বভাব-সিদ্ধ। ইহা অপরাপর বিশ্বাসের ন্যায় নয় যে, অকৃতকার্য্য হইলে উঠিয়া যায়। তৃতীয়-টী দ্বারা এই সত্য অনুভব করিতেছি যে, আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের যে ভাব আছে, তাহার কোন একটী সীমা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের মহত্ত্ব-জ্ঞান স্বাভাবিক এবং ধর্ম্ম ভাবের

মধ্যে অনন্তের ভাব মিশ্রিত; এই উভয় সত্য এক সঙ্গে আলোচনা করিলে কিরূপ ভাব মনে উদয় হয়, ইহাতে কি এই বিশ্বাস অন্তরে প্রবল হয় না যে, আমাদের প্রকৃতিতে যে ধর্ম্ম নিয়ম, সেই ধর্ম্ম নিয়ম সেই বিশ্বের আদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন।

মানব হৃদয়ের এই ধর্ম্মভাবের গভীরতা যে কত, তাহা মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়। একি এক আশ্চর্য্য ভাব মানবকে শাসন করিতেছে!! রোমদেশ হইতে রাজাগণ যখন তাড়িত হইলেন, তখন দুইজন কনসলের উপর নগর রক্ষার ভার অর্পিত হইল। তখন রাজবংশের প্রতি রোমবাসীদিগের এত বিদ্বেষ যে তাঁহারা এই আইন করিয়াছিলেন যে, রোমনগরবাসী যে কোন ব্যক্তি পুনরায় রাজাদিগকে মানিবার ষড়যন্ত্র মধ্যে থাকিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। এইরূপ বিধি প্রচার হওয়ার পর কতকগুলি রোমীয় যুবক উক্ত অপরাধে অপরাধী হইয়া বিচারার্থ উক্ত কনসল দ্বায় নিকটে নীত হইল। দুর্ভাগ্যবশত সেই যুবকদলের মধ্যে একজন কনসলের দুইটী পুত্র ছিল। তিনি যখন বিচারাসনে, তখন সমুচিত বিচার করিয়া আইনসঙ্গত দণ্ড দেওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই জ্ঞানে তিনি যথারীতি সাক্ষ্য প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া যখন স্বীয় পুত্রদিগের দোষ সপ্রমাণ দেখিলেন, তখন তাহাদিগকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। যখন ঘাতকগণ তাহাদিগকে বধভূমিতে লইয়া চলিল, তখন তিনি বস্ত্রে মুখ আবরণ করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। এক দিকে অপত্য স্নেহ অপর দিকে কর্ত্তব্য জ্ঞান, সংগ্রামে কর্ত্তব্য জ্ঞানই জয়যুক্ত হইল, এমন ব্যাপারটা মানব ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীতে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? বিগত মিউটিনীর সময় সার হেনরি লরেন্স অযোধ্যার কমিশনর ছিলেন। তিনি নিতান্ত অসুস্থ ও ভগ্নশরীর হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, হঠাৎ লক্ষ্ণৌ নগরে সংবাদ আসিল যে, সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অধিকার পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌএর দিকে আছিতেছে। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, সেই বিপদের সময় তাঁহার নিজের গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশীয়দিগের প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া সেই রুগ্ন দেহে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক দল সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং ২৪ ঘণ্টা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। তৎপরে পরাজিত হইলে, লক্ষ্ণৌ নগরের প্রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া আসিয়া, সহরের ও চতুঃপার্শ্বের সমুদায় ইংরাজকে সেই বাড়ীতে পুরিয়া বাড়ীটাকে দুর্গপ্রায় করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক দিন এক কামানের গোলা তাঁহার গৃহ মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিল। সেই প্রহার বেদনায় তিনি মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন, ইহার পর কয়েক দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেই অসহ্য যাতনার মধ্যে সতত সেই বাড়ীতে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন, আহতদিগের শুশ্রূষার বন্দোবস্তের উপদেশ দিতেছেন, স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার পরামর্শ দিতেছেন, শিশুদিগের তত্ত্ব লই-

তেছেন। পাঠক মহাশয় কোন পশুতে এপ্রকার কর্ত্তব্য জ্ঞানের কল্পনাও করিতে পারেন কি না? শরীর মন সমুদায় অবসন্ন, সমুদায় বিশ্রাম চাহিতেছে, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান চুলে ধরিয়া পরিশ্রম করাইতেছে—এই স্বর্গীয় দৃশ্য কেবল মানবে সম্ভব। একদিকে যেমন কর্ত্তব্য জ্ঞান অপর দিকে অনুতাপ। অনুতাপের অশ্রু মুক্তাফল হইতেও সুন্দর। এ অশ্রু ফেলিবার অধিকার কেবল মানবেরই আছে। আমার যাহা করা উচিত ছিল তাহা করিতে পারি নাই, ইহা বলিয়া কোন নিকৃষ্ট প্রাণীকে কবে ম্লান হইতে দেখিয়াছেন? এই আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা ও লজ্জার গভীরতা কেবল মানবেই সম্ভব। যিনি এই উচ্চতা ও গভীরতাকে মানব প্রকৃতিতে নিহিত করিয়াছেন, তিনি যে "ধর্ম্মাবহ পাপানুদ" "ধর্ম্মের আবহ ও পাপের শাস্তিদাতা," তাহা কি সহজ বুদ্ধিতেই অনুভব করা যায় না?

তবেই দেখুন, সেই আদ্যাশক্তিতে যদি জ্ঞান থাকিল, ক্রিয়েচ্ছা থাকিল, প্রেম থাকিল, ধর্ম্ম নিয়ম থাকিল, তাহা হইলে তিনি তাড়িত বা অন্য কোন ভৌতিক শক্তির ন্যায় জড় শক্তি হইলেন না, কিন্তু সচেতন পুরুষ হইলেন। যে অর্থে স্ত্রী পুরুষ শব্দ ব্যবহার হয়, সে অর্থে এই পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে না। জ্ঞান প্রীতি ও ক্রিয়েচ্ছাসম্পন্ন যিনি, তিনি পুরুষ। এই জন্যই প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত যোগ দিয়া বলিতে ইচ্ছা করে;—

বেদাহং মেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥

অর্থ—"অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী—এই মহৎ পুরুষকে আমি জানিয়াছি—ইহাঁকে লাভ করিয়া মানুষ মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে, যাইবার অন্য পথ নাই।"

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

নারায়ণ দেব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

এমন একদিন ছিল, যখন বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে আবাল বৃদ্ধ সকলে "পার্সী" শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিত। শুধু পাঠ করিত এমন নহে, বঙ্গীয় গায়কগণ "রাম বনবাস" "সীতার বনবাস," "অভিমন্যু বধ" প্রভৃতি রামায়ণ মহাভারতোক্ত মহদাখ্যায়িকার ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের জঘন্য কুরুচিপূর্ণ কাহিনী নানা রাগ রাগিনীতে দেশময় গাহিয়া ফিরিত। সৌভাগ্য ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে—ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মাহাত্ম্যে বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি আক্ষেপের বিষয় যে, কলিকাতার কুরুচিপোষক অভিনয় গৃহ গুলিতে আজও বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব হ্রাস পায় নাই, মধুসূদন হেমচন্দ্রের সুরুচি পূর্ণ কবিতাবলী আজও ভারতচন্দ্রের চিতা ভস্মের উপর বিস্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই। ভারতচন্দ্রের

কুরুচিপূর্ণ রচনাবলী বঙ্গবাসীর অস্থি মজ্জাতে এরূপ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, তথাপি বাঙ্গালির রুচি-বিকার দূর হইল না! এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাহারো কাহারো মুখে ভারত-চন্দ্রের যশোকীর্ত্তন শুনিয়া আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইয়া থাকি। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর লেখক দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহারা বাঙ্গালীর এই কুরুচি-বুভুক্ষার খোরাক যোগাইতে বসিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়?

আর শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই বা বলিব কি? তাঁহাদিগকে এখন ভ্রান্ত জাতীয়তা রোগে ধরিয়াছে। এই জাতীয়তার বিকৃত ভাবে তাঁহাদের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণতর হইতেছে, বিচার শক্তি হ্রাস পাইতেছে। তাই কেহ কোন প্রাচীন কবির দোষ প্রদর্শন করিলে, তাঁহারা তাহার উপর চোখ রাঙ্গাইয়া উঠেন। কাহার সাধ্য তাঁহাদের নিকট কালিদাসের রুচির নিন্দা করে? এই বিকৃত জাতীয়তার প্রভাবেই আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দুদিগের পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান গুলি রঙ্গভূমির প্রাঙ্গনে লাঞ্ছিত হইতেছে! মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের যে পবিত্র মধুর হরিনাম এক কালে পাপীর মুক্তিপ্রদ ছিল, আজ তাহা অপবিত্র রঙ্গভূমির অভিনয় সামগ্রী! যাক্ দেখি, কোন্ ইউরোপীয় অভিনেতৃ-সম্প্রদায় মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ-বিদ্ধ-ক্রিয়া অভিনয় করিয়া নিরাপদ থাকিতে পারে? আর আমাদের দেশে? আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়—হিন্দু ধর্ম্মের ভাণকারী যুবকবৃন্দগণ, জাতীয়তার গড্ডলিকায় পড়িয়া, সেই পবিত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম গুলিকে বারাঙ্গনা-বিলাসাসক্ত অভিনেতৃগণের ক্রীড়াসামগ্রী দেখিয়া ক্ষোভ করা দূরে থাকুক, বরং উৎসাহ প্রদান করিতেছেন! কেবল তাহাই নহে, কলিকাতার কত সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের মধ্যে কুলনারীদিগের সমক্ষে কুলটাগণ শচীরাণী ও সাধ্বী সতী বিষ্ণুপ্রিয়া সাজিয়া ধর্ম্ম, নীতি ও সুরুচির মস্তকে পদাঘাত করিতেছে। এ সকল কথা ভাবিতে গেলে, নিজের উপর নিজের ঘৃণা জন্মে; জাতীয় কলঙ্ক স্মরণ করিয়া অন্ধকারে মুখ লুকাইতে ইচ্ছা করে। অন্ধ জাতীয়তার ধূমে পড়িয়া আমরা এমনই হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িতেছি যে, আমাদের যাহা কিছু প্রাচীন আমাদিগকে তাহারই প্রশংসা করিতে হইবে! এই সংস্কার বশতই ভারতচন্দ্র ধীরে ধীরে আবার সমাজে যেন প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছেন,—কলিকাতার রঙ্গভূমিগুলিতে সময় সময় বিদ্যাসুন্দরেরও অভিনয় হইয়া থাকে! আমাদের এই রুচি-বিকৃতি দেখিয়াই বঙ্গীয় কোন প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচক বলিয়াছেন যে—

"That this work (Vidya Sundar) should generally, we might almost say universally, be considered to be the best work in the (Bengali) language, that the descriptions should be universally admired by our countrymen and learnt by rote, that Bharat Chandra should *still* be considered as the greatest poet of Bengal and should be spoken of with rapture, afford a curious index to the education and taste of our countrymen."

Literature of Bengal, P 159.

আমরা নারায়ণ দেব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এত গুলি অবান্তরিক কথা বলিলাম কেন, তাহার কারণ আছে। অনেকেই নাকি মনে করেন যে, বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্রই সর্ব্ব প্রধান। প্রাচীন কবিই বা বলি কেন, কাহারো কাহারো মুখে এরূপ কথাও কখনো কখনো শুনিতে হয় যে, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আজ পর্য্যন্ত এদেশে কেহ জন্মায় নাই।। আজ আমরা তাঁহাদের এই সংস্কারের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দেখাইব যে, ভারতচন্দ্র ছন্দোবন্ধে ও ভাষা-পারিপাট্যে অদ্বিতীয় হইলেও তিনি একজন মৌলিক (Original) কবি নহেন। তাঁহার যাহা কিছু ভাল মন্দ রচনা, তাহার অধিকাংশই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর রচনার ভাব লইয়া। তিনি পদে পদে, নায়ক নায়িকা কি উপনায়ক উপনায়িকা, প্রায় প্রত্যেকের চরিত্রেই মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন; অনুকরণ করিয়াছেন বলিলে ঠিক হয় না, ললিত পদাবলীতে তাঁহার রচনার অনুবাদ করিয়াছেন বলাই বরং অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া কবিকঙ্কণ ও রায়গুণাকরের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের এই উক্তির সাক্ষ্য দিবেন। তথাপি সাধারণ পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা দুই একটী স্থান নির্দ্দেশ করিব। প্রথমত অন্নদামঙ্গল সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। কবি সতীর জন্ম হইতে প্রকৃত গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপর দক্ষযজ্ঞ, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ও পুনরায় হিমালয়ের গৃহে জন্ম, উমার সহিত শিবের বিবাহ প্রভৃতি অতি আমোদজনক সুললিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে আমরা ভারতচন্দ্রের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, এই সমস্তই মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ফুল্লরা উপাখ্যানের প্রথমাংশের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈশ্বরী পাটুনীর নিকট অন্নদার ছদ্মবেশে পরিচয় প্রদান অংশ অন্নদামঙ্গলের আদর্শ রচনা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সেই অংশ মুকুন্দরামের চণ্ডীর ছদ্মবেশে ফুল্লরার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান অংশের একেবারে অক্ষরে অক্ষরে নকল। মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রের কবিতার তুলনা করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, নতুবা উভয়ের রচনা পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা যাইত। আমরা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক উভয়ের গ্রন্থ একত্রে পাঠ করিয়া দেখিবেন।

তার পর "বিদ্যাসুন্দর"। বিদ্যাসুন্দরের গল্প সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিতে প্রবৃত্তি নাই; তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার ন্যায় জঘন্য কুরুচিসম্পন্ন রচনা বাঙ্গালা ভাষায় অন্য কিছু আছে কি না, আমরা জানি না। আর বোধ হয় ইহারই অনুকরণে বুঝি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তার সৃষ্টি। যত শীঘ্র সম্ভব এ সকল গ্রন্থের প্রকাশ এ দেশে লোপ পায়, ততই দেশে সুনীতি ও সুরুচি প্রচারের সুবিধা। কিন্তু বটতলার দুষ্টা সরস্বতী ও কলিকাতার অভিনয় গৃহগুলি ইহাদিগকে মরিয়াও মরিতে দিতেছে না। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনায় তাঁহার শব্দচাতুর্য্য ও ললিতপদাবলীর বাহার ছড়া-

ইতে গিয়া বর্ণনীয় বিষয় এত দূর অপ্রাকৃতিক করিয়া তুলিয়াছেন যে, নায়ক নায়িকার প্রকৃতিতে পবিত্র ভালবাসাকেও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাতে পরিণত করিয়াছেন! বিদ্যা এবং সুন্দরের জীবনে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ভিন্ন অন্য কোন মানবীয় কি দেব প্রবৃত্তি ছিল এরূপ মনে হয় না। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই যেন তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই গল্পও ভারতের স্বকপোলকল্পিত নহে—ইহাও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের অনুকরণ। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম-প্রণেতা সাধকবর রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের উপর ভাষার আড়ম্বর ও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করিয়াছেন মাত্র। বিদ্যা ও সুন্দরের বিষয় ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রগুলি বরং অধিকতর প্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে মালিনী চরিত্র, কতোয়ালের প্রকৃতি প্রভৃতি সমালোচকগণ বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, তাহাও মুকুন্দরামের "দুর্ব্বলা" ও "কালকেতুর" ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি, ভারতচন্দ্রের ৩৪ অক্ষরে কালীর স্তবও মুকুন্দরামের নকল। তবে ভারতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ—যে বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাচীন কি আধুনিক কোন কবিই তাঁহার সমতুল্য নহেন—বর্ণনীয় বিষয়ের উজ্জলতা সম্পাদন (Vividness of his descriptions), কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা গুণের বিষয় না হইয়া বরং দোষেরই বিষয় হইয়াছে। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের অভিমত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে গেলে, এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি এক জন শাব্দিক ও আলঙ্কারিক কবি ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ও মৌলিক কবি নহেন। পূর্ব্বোক্ত "বঙ্গীয় সাহিত্য" প্রণেতা তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠক একবার তাহা পাঠ করুন—

"He has the power of raising in the reader's mind the very feeling he describes, though the feeling is often of a reprehensible character. His poetry has the *character* of Satan, but it has also the *power* of Satan, to tempt and to seduce."

"In all the higher qualifications of a poet in simplicity, and truth, in imagination, in sublimity and grandeur of conception and thought, nay, even in true tenderness and pathos, such as we meet with in almost every other Bengali poet, Bharat is singularly and sadly wanting. Inspite therefore of the fascination of his descriptions and the richness of his language, we are tempted, on reading his books, to exclaim with Hamlet, 'words, words, words.'"

কোন দুই কি ততোধিক কবির সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই তাহাদের সময় ও বর্ণনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে দুই কি ততোধিক সমসাময়িক কবির এক বিষয়ে বর্ণিত রচনার সমালোচনা করাই সুযুক্তি সঙ্গত। তাই আমরা নারায়ণ দেবের রচনার তুলনা করিতে গিয়া ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম। মুকুন্দরাম কিম্বা ভারতচন্দ্র ইহাদের কেহই নারায়ণ দেবের সম-সাময়িক নহেন। নারায়ণ দেব ইঁহাদের উভয়েরই বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। তবে নারায়ণ দেবের বর্ণনীয় বিষয়ের বিষয়-গত সাদৃশ্য আছে। ভারতচন্দ্র আলঙ্কারিক ও শাব্দিক কবি, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মুকুন্দরাম এক জন স্বাভাবিক ও মৌলিক কবি। মুকুন্দরাম

কোন্ শ্রেণীর কবি, পাঠক যদি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায় রত্নের বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। "বঙ্গীয় সহিত্য" প্রণেতা তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"A long conversation ensues (between disguised Chandi and Fullara), and the whole is one of the most beautiful passages we have anywhere seen or read. The passage is not marked by any deep poetical feeling, but is so exceedingly natural and intensely real that it almost reminds one of Shakespear himself."

Literature of Bengal, page 115-16

স্থানান্তরে বলিয়াছেন—

"Regarding the characteristic features of the poetry of Mukunda Ram we have said much already. The most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are superhuman or wonderful or miraculous; but the thoughts and sayings of the men and women and all such as we see and hear around us, recorded with a fidelity and a skill which has no parallel in the whole range of Bengali literature. Open any page in the book, and you will find it. Page 137.

আমরা আজ সেই মুকুন্দরামের রচনার সহিত নারায়ণ দেবের একবিধ রচনার তুলনা করিয়া দেখাইব যে, নারায়ণ দেব মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও কবিত্ব শক্তিতে, মানব হৃদয়ের প্রকৃত ছবি অঙ্কনে মুকুন্দরাম অপেক্ষা হীন ছিলেন না। নারায়ণ দেবের পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় কেহ তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ে কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন কি না, এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বরং ইহাই দৃঢ়তর হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে অন্তত পূর্ব্ববঙ্গে অন্য কেহ এ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। পশ্চিম বঙ্গে সে দিনের কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ দাসের দুখানা চটি বই ভিন্ন ত অন্য কোন বই আমরা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। এই দুই খানা চটিকে সত্যনারায়ণ ও শনির পাঁচালি বলিলেই চলে, নারায়ণ দেবের গ্রন্থের সহিত একত্রে ইহাদের নামোল্লেখ না করাই বরং শ্রেয়। নারায়ণদেব এবং মুকুন্দরাম উভয়েই স্বাভাবিক এবং মৌলিক কবি ; সুতরাং ইহাদেরই রচনার তুলনায় সমালোচন শোভা পায়। আজ আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু পাঠক একটী কথা মনে রাখিবেন যে, উভয়ের বর্ণনীয় বিষয় এক হইলেও উভয়ে সম সাময়িক নহেন। নারায়ণ দেব বর্ত্তমান সময়ের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের লোক, মুকুন্দরাম রামায়ণ-প্রণেতা কীর্ত্তিবাস ওঝার সম-সাময়িক ও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

"আদি দেব নিরঞ্জন, যার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি, চিন্তিলেন মহামতি
সৃজনের উপায় কারণ॥
নাহি কেহ সহচর, দেবতা অসুর নর
সিদ্ধ নাগ চরণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবানিশি, না উদয় রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
কোটি ভানু সুপ্রকাশ, পরিধান পীতবাস,
অন্ধকারে ভাবে ভগবান্।

কনক কঙ্কণ হার, দূরে করে অন্ধকার,
পূরট মুকুদ মুনি দান॥"

মুকুন্দরাম।

"না ছিলেক আকাশ, রবিশশী প্রকাশ,
না ছিলেক গমনাগমন।
না ছিলেক দিবারাতি, পর্ব্বত পৃথিবী
না ছিলেক এ তিন ভুবন॥
পঞ্চভূত হৈয়া, গঠিল সুমেরু কায়া
নিরঞ্জন রূপে হৈল স্থিতি। (ক)
জ্যোতি হৈতে প্রাণ মন, জ্ঞানে হইল চেতন
পরম পুরুষ উৎপত্তি॥
একেশ্বর নিরঞ্জন, দোসর নাহি অন্য জন
চিন্তে সৃষ্টি পাতিবার আশে।
নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বল্লভ হয়
যে কথা শুনিলে পাপ নাশে॥"

নারায়ণদেব।

সতী লোক-মুখে দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিয়া পিত্রালয় যাইতে শিবের নিকট অনুমতি চাহিতেছেন, শঙ্কর অনুমতি দিতেছেন না। সতী বলিতেছেন :—

"অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে;
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে?
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর গুণনিধি
যান পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস,
নিবেদন নাহি করি ডরে॥

(ক) "স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, আছিলেক একাকার
না আছিল পবনের গতি।
আদি অন্ত নাহি শুনি, শূন্যে উপজিল ধ্বনি
নিরঞ্জন হইল উৎপত্তি॥"
শাটাম্বর।

পর্ব্বত কাননে বসি, নাহিক পাড়া পড়সী,
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্ম দুঃখী॥
সুমঙ্গল সুত্রধরে, আইলাম তব ঘরে
পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত।
দূর কর বিসম্বাদ, পূরাহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মোর পুণ্যবান, করিবে অনেক দান
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান
ভেদ বুদ্ধি নাহিক পিতার॥
সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন॥"

মুকুন্দরাম।

সতী নারদের মুখে পিতৃযজ্ঞের সংবাদ ও তাঁহার ভগ্নীদিগের নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া মহাদেবের নিকট যজ্ঞে যাইতে বিদায় চাহিতেছেন, মহাদেব নিষেধ করিতেছেন। তখন সতী ছল ধরিয়া বলিতেছেন:—

"তখন শঙ্করী কহেন ছলে, না গেলে কি মোর চলে?
চঞ্চল হইল মোর প্রাণী।
দক্ষ হরে তব মান, মনে করি অনুমান,
এ সন্ধান না জানে জননী॥
আমার মা রৈছে * পথ চাইয়া, এখনো আইল না মাইয়া, †
বলি মায়ের জীবন্ত কায়া।
তুমি জান ওহে পশুপতি, সংসারে সন্তান প্রতি
গর্ভধারিণীর কত মায়া॥

* রৈছে—রহিয়াছে। † মাইয়া—মেয়ে।

এত বলি মহামায়া, করিয়া মায়ের মায়া
দুই আঁখি ছল ছল করে,
দ্রুত যান এত বলি; "যাইওনা যাইওনা" বলি
গঙ্গাধর ধরেন দুই করে॥
তথাচ চঞ্চল মতি, বিনা পতির অনুমতি
সতীর গমন পিত্রালয়।
অ-মতি লৈতে শিবে, আতঙ্ক দেখায় শিবে,
দশমহাবিদ্যা রূপোদয়॥"

নারায়ণ দেব।

মুকুন্দরাম, পতির অনুমতি না লইয়াই সতীর পিতৃ গৃহে গমন বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু নারায়ণ দেবের সতী,দশমহাবিদ্যা রূপে মহাদেবকে ভয় প্রদর্শন করিয়া, পতির অনুমতি লইয়া পিতৃগৃহে গমন করিয়াছেন। এ রচনাটী এত সুন্দর যে আমরা পাঠক দিগকে তাহা উপহার না দিয়া পারিলাম না।

"প্রথমে হন কৌষিকী, কালিকা করালমুখী
না-বাসনা বিবসনা অঙ্গ।
ক্রোধ করি হরোপরে, বিহরে হর উপরে
হর-রাণী করে নানা রঙ্গ॥
নীলাম্বুজ জিনি আভা, আউলোকেশী লোল
জিহ্বা
মহীর বিপদ পদ ভরে।
অশিতাক্ষী ভালে শশী, অসিতে অসুর নাশি
অট্ট হাসি ধরে না অধরে॥
ভয়ঙ্কর-রূপ-ধরা, হুহুঙ্কারে কাঁপে ধরা,
দৈত্য অহঙ্কার-হরা কালী।
কঙ্কালির কক্ত-খেলা, গলে নর-শির মালা,
নর-কর-বেষ্টিত কাঁকালি॥
দেখি ভয়ে পঞ্চমুখ, আতঙ্কে ফিরায় মুখ,
সম্মুখ হইলা দৈত্য-নাশা।
মুখে দিয়া বাঘাম্বর, যে দিকে যান দিগম্বর,
সেই দিগে যান দিগ্বাসা॥
পূর্ব্বে গেলে পূর্ব্বে যান,দক্ষিণে করিলে প্রয়াণ,
দক্ষিণে দক্ষিণাকালী যান।
তারার দেখিয়া তারা, মুদিয়া নয়ন-তারা,
ত্রিনয়ন তারা গুণ গান॥"

মহাদেব সতীর দশ মহাবিদ্যা রূপ দেখিয়া ভীত হইয়া অবশেষে ধনী-কন্যা প্রণয়া গৃহিনীর দীন দুঃখী স্বামীর ন্যায় মনোদুঃখে বলিতেছেন;—

"বলেন পিতৃ-গৃহে তুমি যাও অতি ত্বরা।
মোরে দুঃখ আর দিওনা দুঃখ-হরা॥
থাকে দয়া হে নিদয়া আইস পুনরায়।'
মোর শক্তি নাহি শক্তি রাখিতে তোমায়॥
কোন্দল করিলে মোর বাড়িবে অযশ;
ভিক্ষাজীবী জনের রমণী কোথা বশ?
বিশেষ তোমার কাছে আমি নাহি গণ্য।
রাজ কন্যা তুমি মান্যা, আমি দীন দৈন্য॥
দুইটী কর আমার, তোমার দশ কর।
আমি বৃষোপরে, তুমি সিংহের উপর॥
তুমি হেম-বর্ণা, আমি রজত বরণ।
রজত কাঞ্চন তুল্য নহে কদাচন॥
তবে কি গুণে ত্রিগুণে তুমি হবে বশীভূত?
জীবনে কি ফল মোর, আছি জীবন্মৃত॥
আমার উপরে আগা দেখাও নানা ভয়।
এড়াই তোমার জ্বালা মৃত্যু যদি হয়॥"

মহাদেবের মনোদুঃখে সতীর বড়ই দুঃখ হইয়াছে, তাই তিনি পতিকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন:—

"পতির অভিমান বাক্যে,বাজিলা সতীর বক্ষে,
সজল নয়নে কন তারা।
দক্ষ হবে তব মান, ইতে কি আছে মান?
অপমান করি গিয়া ত্বরা॥
দিব সমুচিত ফল, করিব যজ্ঞ বিফল,
কলাক্ষন হবে কর্ম্ম দোষে।

এত বলি ক্রোধ মতি,নন্দী সাথে লৈয়া সতী,
 যাইয়া বসি দক্ষরাজ বাসে।
অপমানী হেরি শিবে, সুবর্ণ বরণী শিবে,
 বিবর্ণ হইল দুঃখে কায়া।
দীন দুঃখিনীর প্রায়, মায়া করি গিয়া তায়,
 দরশন দেন মহামায়া॥"

মুকুন্দরামের সতী পতির অনুমতি না লইয়াই পিতৃ গৃহে গিয়াছেন। সতীর মাতা প্রসূতি প্রাণে সতীর আগমন সংবাদ শুনিয়া সতীকে আনিতে চলিয়াছেন,—

"পাইলা বাপের গ্রাম, শুনিয়া সতীর নাম,
 প্রসূতি ধাইল বেগবতী।
কোলেতে লইয়া সতী, প্রসূতি পুলকে অতি,
 কৈল সতী মায়েরে প্রণতি॥
আনিয়া আপন ঘরে, প্রসূতি দিলেন তারে,
 পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন।
যতেক ভগিনীগণ, সবে হরষিত মন,
 ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন॥
জননী ভগিনী সঙ্গে, ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে,
 যান দেবী যজ্ঞের সদন।
চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি
 চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

কিন্তু নারায়ণদেব এত সহজে সতীকে যজ্ঞস্থলে লইয়া যান নাই। তিনি কিরূপ করিয়াছেন, পাঠক স্বয়ং তাহা পাঠ করিয়া মানব হৃদয়ের চিত্র অঙ্কনে কে কত দূর সুপটু, অপক্ষপাতে একবার তাহার বিচার করুন,—

"কন্যার বিবর্ণ কায়া, চক্ষে হেরি দক্ষ-জায়া,
 চক্ষে বারি বক্ষে কর হানি;
বলে সতী সত্য বল, তবে গাই অঙ্গে বল,
 কাল কেন কাঞ্চন-বরণী?
তোমাকে দেখিতে সতী, নক্ষত্র সপ্তবিংশতি
 ভগ্নী তব আইল যজ্ঞস্থলে।
এরূপ দেখিলে তারা, মরমে মরিবে তারা,
 ভাসিবে নয়ন-তারা জলে॥
কত দুঃখ কব আর, নারদের মন্ত্রণায়
 ঘটিয়াছে তোমার এ দুর্গতি।
আমি না দেখিলাম বর, উদাসীন দিগম্বর,
 সেই হৈল রাজ কন্যার পতি!!
সেকালে সকালে বলে, রাণী তোর পুণ্য ফলে
 জামাই হৈল ত্রিপুরারী।
সবাই কহিল শিবে,মাইয়া তোর সুখে ভাসিবে
 সে শিবের কুবের ভাণ্ডারী॥
(তখন)কেহ না কহিল আসি,শঙ্কর শ্মশানবাসী,
 তবে কি সঙ্কট ঘটে আর?
কপালে লিখন চণ্ডী, কার সাধ্য নহে খণ্ডি
 পতি দণ্ডী হইল তোমার॥
কপালে যা ছিল হৈল,কাঁদি আর কি করি বল,
 গত কর্ম্মে বৃথা চিন্তা করি।
যদি রক্ষা কর মোরে,এই হইতে কৈলাসপুরে
 ফিরে আর যাইও না শঙ্করী॥"

প্রসূতির খেদে সতী কি বলিতেছেন, পাঠক তাহাও শুনুন;—

"জগৎ জননী কন শুনগো জননি!
মৃত্যু হেতু আজি মোর প্রভাত রজনী॥
পতি মোর পশুপতি সংসারের পতি।
তারে করে অনাদর দক্ষ প্রজাপতি॥
অঙ্গকালী হৈল মোর সেই দুঃখে দুঃখী;
নতুবা সংসারে কেবা মোর তুল্য সুখী?
আমার দুর্গতি তোকে কে বলে জননি?
আমি জানি আমি ত মা দুর্গতিনাশিনী॥
কাশীখণ্ড আমার কাণ্ড আমি কাশীশ্বরী।
অন্নপূর্ণারূপে লোকে অন্নদান করি॥
শুনিবাণী দক্ষরাণী মোক্ষদারে বলে।
মা তোমার অপমান শুনি প্রাণ জ্বলে॥
কুলের মধ্যে থাকি আমি কুলের কামিনী।
কুকর্ম্ম করিছে দক্ষ স্বপনে না জানি॥

অশেষ দেবতা আছে এই ত্রিভুবনে।
বিশেষ সম্পর্ক মোর শঙ্করের সনে॥
এত বলি ভাসে রাণী নয়নের জলে।
সঙ্গে করি শঙ্করীরে যান যজ্ঞ স্থলে॥"

মুকুন্দরাম সতীকে একাকিনী যজ্ঞ স্থলে পাঠাইয়াছেন এবং নিতান্ত মুখরার ন্যায় যজ্ঞস্থানে স্বামীর পূজা না দেখিয়া পিতাকে ভৎসর্না করাইতেছেন:—

"দক্ষের চরণে সতী করিল প্রণতি।
হেট মুখে আশীষ করিল প্রজাপতি॥
জাইয়োতে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি।
চিরজীবি হউক স্বামী সুস্থির সুমতি॥
না দেখিয়া যজ্ঞস্থানে শিবের পূজন।
কোপে কম্পমান তনু বাপে জিজ্ঞাসন॥
শোন বাপা তোমারে এ করি অভিমান।
সতী ঝির প্রতি তব নাহি অবধান॥
ধর্ম্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুগণ।
সবাকে আসিতে যজ্ঞে দিলা নিমন্ত্রণ॥
শিব নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে?
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে॥
ব্রহ্মা যাঁর সতত বাঞ্ছয়ে পদধূলি।
আপনি কমলাপতি করেণ অঞ্জলি॥
অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার॥
দারুণ দৈবের ফলে আমি তব ঝি;
না করিলা ভাল কর্ম্ম নিবেদিবে কি?
এমন শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন।
নিন্দিয়া বলেন শিবে শুনে সর্ব্বজন॥"

কিন্তু নারায়ণদেবের সতী, পিতার মুখরা কন্যা নহেন, নিজে পিতাকে একটী কথা বলেন নাই। মাতা প্রসূতি, কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সতীকে লইয়া যজ্ঞ স্থানে পতি দক্ষের নিকট গমন করিয়া বলিতেছেন:—

"বলেন মহারাজ, যত বুদ্ধিমন্ত তুমি।
কন্যার দেখিয়া মূর্ত্তি বুঝিলাম আমি॥
হাতে ধরি গঙ্গাধরে দিলা কন্যাদান;
শিরোধার্য্য হরের কি জন্য হয় মান?
নিতান্ত তোমার বুদ্ধে ঘটেছে যন্ত্রণা;
কুমন্ত্রী নারদ বুঝি দিল কুমন্ত্রণা?"

মুকুন্দরামের সতীর ভৎর্সনা শুনিয়া দক্ষ সতী প্রতি শিবের নিন্দা করিতেছেন:—

"কহিতে উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা,
যেবা ছিল ললাটে লিখন।
তোমার কর্ম্মের গতি, স্বামী—হৈল দুর্ম্মতি,
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ॥
আরোহণ বৃষোপরে, শিঙ্গা ডমরুর করে,
ভক্ষ্য যার ধুতুরার ফল।
ভাঙ্গে বড় অভিলাষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস,
ফণি হার ফণির কুণ্ডল॥
পরিধান বাঘ ছাল, গলায় হাড়ের মাল,
বিভূতি ভূষিত যার অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে॥
আরাধিলা পশুপতি, পাইলা পশুর গতি,
অহী সঙ্গে একত্রে শয়ন।
হরি শিরে শশী কলা, অহী সঙ্গে যার খেলা,
বঞ্চিত ভুবনে দুই জন॥"

নারায়ন দেবের দক্ষ, প্রসূতির ভৎর্সনায়, স্ত্রীর উদ্দেশে শিবনিন্দা করিয়া বলিতেছেন:—

"রাজা বলে নীতি শিক্ষা শুনিব কি তোর?
সাধেতে বিবাদ বটে হেন সাধ কি মোর?
তারে যত্ন করি রত্নপুরে চাইয়াছি রাখিতে;
কাপালির সুখ নাই পারে কি থাকিতে?
পাগলের সম্ভাষণ করার কোন্ প্রয়োজন?
সাগরে ফেলেছি কন্যা বলিয়া বুঝাই মন॥

অদ্ভুত সঙ্কেতে ভূত শ্মশানে ভ্রমিছে।
সেটা পূর্ণ ক্ষেপা, তারে কৃপা করা মিছে॥
তার কথা বলিব কি মাথা মুণ্ড ছাই।
তৈল বিনা সর্ব্বদা সে গায় মাখে ছাই॥
মহাপাপ ধরি সাপ গলায় পরে পৈতে।
তারে আনিলে লোকে হাসিবে, তাই হবে সৈতে।”

তাহার পর উভয়ের সতীই দক্ষকে অভিসম্পাত দিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাঠক, আমরা অধিক আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না; কাহার রচনা কেমন, কোনটী অধিকতর স্বাভাবিক, তাহা আপনি বিচার করিয়া লউন। প্রস্তাব বড় সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, যদি সময় পাই ত আবার কতকগুলি এক বিষয়িনী রচনা আপনাদিগকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগগনচন্দ্র হোম।

ঈশ্বর বিশ্বাস ও দার্শনিক প্রমাণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান লক্ষণ, বিচার ও বিপ্লব। যে সকল ভিত্তির উপর বহুকাল পর্য্যন্ত কত লোকের জীবন পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে ছিল, এ যুগে সে ভিত্তি টলিতে আরম্ভ হইয়াছে; এক দিন যাহা অবশ্য অবলম্বনীয় ছিল, এ যুগে তাহার কঠোর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। যে ঈশ্বরের নামে, পরলোকের নামে এবং চির-প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির নামে, এক দিন মনুষ্য-হৃদয় ভক্তিতে অবনত হইত; এই বুদ্ধি-প্রধান যুগে, সেই ঈশ্বর, পরলোক এবং সামাজিক আচার ব্যবহারে আর তেমন শ্রদ্ধা নাই, বরং অনেক স্থলেই সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ঘনীভূত হইয়াছে। বিলাতে স্পেন্সার এবং কোমতের শিষ্যগণ অবিশ্বাসীদিগের মুখপাত্র স্বরূপ। মার্টিনু, কেরার্ড, ফ্লিন্ট প্রভৃতি কয়েক জন, এই অন্ধকার দূর করিবার জন্য, অবিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য, বদ্ধ পরিকর। কিন্তু বিশ্বাস-স্থাপনকারীদিগের আলোক অতি ক্ষীণ, অতি ক্ষুদ্র; আবার স্পেন্সার প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন অন্ধকার অতি নিবিড় এবং অসীম।

পরাধীন ভারতবর্ষ বিলাতের ছায়া মাত্র। কাজেই শিক্ষিত নব্যভারতবাসীর হৃদয়েও এই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ঢালিয়া পড়িতেছে। তেত্রিশ কোটী দেবতা আজি কেবল নিরক্ষর গ্রামে, শিষ্য-যজমানাশ্রিত ভট্টাচার্য্যের পুরাতন গ্রন্থে, এবং আলস্যপ্রিয় কবির কল্পনায় কিম্বা অর্থলোলুপ পশারপ্রার্থী সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের লেখনী মুখে অবস্থিতি করিতেছে। স্বর্গ ও নরক, এ যুগে বিকার-গ্রস্তের আর্ত্তনাদ বলিয়া শিক্ষিত সমাজে উপহসিত!! নব্য শিক্ষিতদিগের এই সংশয় জাল ছিন্ন করিবার জন্য, ঈশ্বর ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ অনবরত চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্রাহ্ম সমাজেও দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইতেছি; এক শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া, আত্মজীবনে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া, আত্ম অভিজ্ঞতা, তর্কহীন ভাবায় সকলকে শুনাইতেছেন; অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা, যুক্তি ও তর্ক বলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট! মৃতমহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য প্রতাপ

চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি, প্রথম শ্রেণী ভুক্ত; ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, Roots of faith-প্রণেতা সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের উদ্যম কত দূর যুক্তিসঙ্গত—এবং সাধারণত, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বর-নির্ণয় কতদূর সম্ভবপর, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা হইবে। একটী প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশদ সমালোচনা প্রত্যাশা করা যায় না; তবে সর্ব্বদা যে সকল যুক্তি তর্ক অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার ছিদ্র দেখাইয়াই নিরস্ত হইব; চিন্তাশীল পাঠকগণ, কোন্ পক্ষের যুক্তি কত দূর প্রবল, আপনারা বুঝিয়া লইবেন।

জগৎস্রষ্টা জগৎকর্ত্তা কেহ আছেন কি? এ মহা সমস্যার উত্তর কে দিবে? এই যে পৃথিবী, সুখ দুঃখময়, সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য পূর্ণ, বলিতে পার কি ইহার কেহ নেতা আছে, রক্ষক আছে, প্রাণ আছে? সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা পৃথিবীর অপরূপ রূপ দেখিয়া আর্য্য-ঋষি ঈশস্তুতি গাইয়াছেন, আবার কঠোর শাস্ত্রালোচনা করিয়া সাংখ্যকার বলিলেন, "ঈশ্বর প্রমাণাতীত"। নবযৌবনে উন্মত্ত, নব জীবনে জীবন্ত ইংলণ্ডের লোক-কোলাহলময় আকাশের দিকে তাকাইয়া বেকন বলিয়াছেন যে, "আমি আলমদ্ ও কোরাণের উপকথায়ও বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু অসীম বিশ্বের প্রাণ নাই, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিব না।" কিন্তু হিউমের গবেষণায়, মিলের কূট তর্কে এবং কোমত্ শিষ্যদিগের সূক্ষ্ম বিচারে ঈশ্বর, অজ্ঞেয় এবং অজ্ঞাত প্রমাণিত হইল। চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল, নব্য বাঙ্গালীর উদ্ধারকর্ত্তা কেশবচন্দ্র সেন, এক দিন গোলদিঘির ধারে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, "ঈশ্বর আছেন।" সেই মধুর কণ্ঠস্বর-জড়িত বিশ্বাসের "আছেন" কথা বহুদিন স্মৃতিতে জীবন্ত থাকিবে। কিন্তু মায়াবাদের তর্কে ও কৌশলের যুক্তিতে অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিতেছে। যখনি ধ্যানমগ্ন ঋষির নয়নে প্রেমাশ্রু দেখি, অমনি প্রাণের উৎস খুলিয়া যায়; কিন্তু যখন দর্শনের দাম্ভিক বিচারে, বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে মনোভিনিবেশ করি,—তখন দেখি সকলি শূন্য, সকলি অন্ধকারপূর্ণ। মনের এই ভাবকে, হে দার্শনিক পণ্ডিত, তুমি কুসংস্কার বলিও না; ইহার নৈসর্গিক মূল আছে, উপযুক্ত কারণ আছে, সে কথা সবিস্তারে পরে বলিব।

ইংরাজ দার্শনিক কুলাগ্রগণ্য বার্ক্লি, মায়াবাদের (Idealism) উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে বার্ক্লির প্রবর্ত্তিত মত, কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া, সর্ব্বত্রই একরূপ সত্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে। এই মায়াবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বাবু সীতানাথ দত্ত, সম্প্রতি Roots of faith নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে ঈশ্বর প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। মায়াবাদ এবং ঈশ্বর প্রমাণ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র ইংরাজি গ্রন্থ খানা সম্বন্ধে একটী কথা বলি; আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া বড়ই সুখী হইয়াছি, এই গ্রন্থখানিতে সীতানাথ বাবু সরল ইংরাজিতে আপনার মনের কথা অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকার পুস্তক প্রচারিত হইলে অনেকের ইংরাজি দর্শন

শাস্ত্রাদি পাঠে প্রবৃত্তি হইতে পারে। মায়াবাদের বাহ্য জগৎ সিদ্ধান্ত অতি সুন্দর; নব্যভারতের পাঠকগণ প্রথম বৎসরের নব্যভারতে উল্লিখিত সীতানাথ বাবু কর্তৃক অভিব্যক্ত ঐ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পড়িলে একথা বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই বাহ্য জগৎ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা দু একটী কথা বলিব। মায়াবাদী বলেন যে, বাহ্যজগৎ বলিতে যে দৈর্ঘ, বিস্তার, রূপ, রস, প্রভৃতি গুণ অনুভব করি, এই সকল জ্ঞাত গুণের আর কোন অজ্ঞাত জড় আধার নাই। এস্থলে একটী কথা বলি; আমরা দৈর্ঘ বিস্তার ইত্যাদি গুণ সমষ্টিকে জগৎ বলিয়া অনায়াসে ভাবিতে পারি; এবং স্বীকার করি যে, আধার কল্পনায় কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু জগতাধার নাই, একথা বলাও কি অসঙ্গত নয়? আধার স্বীকার এবং অস্বীকার উভয়ই কি অতর্কিত কথা নহে? আমাদের মনে হয় যে, এস্থলে অজ্ঞেয়তাবাদই সর্ব্বথা প্রশস্ত। তবে বার্ক্লি এবং তাঁহাদের আধুনিক শিষ্যেরা যদি বলেন যে, "আমাদের ঐ জড়াধার অস্বীকার করিবার কারণ এই যে, ঐ জড়াধার কেবল মানস কল্পনা-প্রসূত, এবং শুদ্ধ গুণ পরম্পরাকে শরীরী করিবার চেষ্টা করা মাত্র। বেন্ সাহেবের ভাষায়, "It (অচেতন জগতাধার) is self contradictory and a fictitious entity of the imagination আবার, It is the result of converting the abstract into reality." কিন্তু এই এক মাত্র সার যুক্তি যদি অবলম্বন করা যায় (এ পথে এমীমাংসা ভিন্ন আর গতিও নাই) তাহা হইলে আবার কতকগুলি নূতন গোল বাধিয়া উঠিল; প্রথম গোল, মন সম্বন্ধে। যেমন দেখিতেছি, এ জগৎ জড়াধার শূন্য, কেবলি ভাব-পরম্পরা মাত্র, এবং সেই ভাবও যাহা, আমার মনের ঘটনা বা মনও তাহা, তখন 'আমি' বলিয়া মনের আধারটী কোথায় উড়িয়া যান? আমার মনে (কথাটা প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত হইল) ভাব তরঙ্গ উঠিতেছে, চলিতেছে, মিলাইতেছে, এইত গেল প্রত্যক্ষ ঘটনা; যেমন জগৎ বলিয়াও কিছু নাই, পক্ষান্তরে তেমনি মন বলিয়াও কিছু নাই। স্মৃতি, আশা, বুদ্ধি, সকলি ঘটনা মাত্র (Phenomena)। তবে তর্ক উঠিতে পারে যে, সকল অস্থায়ী ঘটনার মধ্যে যে, এক স্থির আমি-জ্ঞান আছে, ঐ আমি-জ্ঞান কি? তাহা বুঝাইতেছি; আমি-ভাব (Ego phenomenon), জ্ঞানের বা consciousness এর অবস্থান্তর মাত্র। Secretion কথা ব্যবহার করিলে সহজে এভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়। আরও কথা আছে, যদি স্থির আমি-জ্ঞান দেখিয়া মনের আধার মানিতে হয়, তবে সেই নিয়মে জগতের জড়াধার কল্পনা করিবারও ত হেতু আছে? কথাটা ভাঙ্গিয়া বলি; আমরা একটা পদার্থ আস্বাদন করি, এবং দূরে সূর্য্য দেখি, এ দুয়ে কি কিছু প্রভেদ নাই? প্রথম অবস্থা সম্বন্ধে আমার মনের যে ভাব হইতে পারে, দ্বিতীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিন্তু সেরূপ নহে; প্রথম ভাবের পরিবর্ত্তন আছে, দ্বিতীয় ভাবের খুব পরিবর্তন দেখি না। বেন্ বলিতেছেন, "In regard to the Object properties all minds are affected alike: in regard to the Subject properties, there is no constant agreement." তাহা যদি হইল, তবে ত পদার্থের নিজস্ব

কিছু থাকিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে বল যে, গুণ পরম্পরাকে শরীরী করিবার, চেষ্টাজনিত দোষ পঁহুছিল, (We are guilty here of converting an abstract into reality, which is an error of Realism) তবে মন সম্বন্ধেও কেন ঐ কথা বল না? ঘটনাসমূহ পরে পরে সংঘটিত হইতেছে,প্রত্যক্ষ কথা; সেই সংযোগের ফলে জ্ঞান আসিল, স্মৃতি আসিল, আশা আসিল, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা; তবে আর অতিরিক্ত একটা আধার—লইয়া টানা টানির প্রয়োজন কোথায়? এখন যদি জড়াধারের সঙ্গে সঙ্গে "আমি" ও উড়িয়া গেলাম, তবে কোথায় বা গেল ইচ্ছা (will), কোথায় বা গেল ইচ্ছার সহিত কার্য্য-যোগের অভিজ্ঞতা, আর কোথায় বা গেল এ সকল হইতে ঈশ্বর প্রমাণ!! কেহ হয়ত বলিবেন যে, এ তর্ক নিতান্তই তর্ক করিবার জন্য; আমি যে আছি তাহার ত আর ভুল নাই? সে কথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু এ কথা তুলিয়া এইটী দেখান গেল যে, যাহা নিত্য-প্রত্যক্ষ, সে কথা যুক্তি তর্ক দিয়া বুঝাইতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা। এ কথা উপসংহার কালে আরও খুলিয়া বলিব। এখন এ পর্য্যন্ত, এইত গেল মায়াবাদের কঠোর বিচার। তাহার পর, যদিই বা মানিয়া লই যে,"আমি" আছি, "জগৎ" আমার ভাব-পরম্পরারূপে আছে; এবং আমার মনে, আমার অনিচ্ছায় অনেক সময় ঐ ভাব-পরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে। এ কথা মানিলেও ঈশ্বর প্রমাণ সহজ হয় কি? তার্কিক বলিবেন যে, কেন? যখন আমার ইচ্ছা ভিন্ন এই সকল ভাব পরম্পরা তরঙ্গ তুলে, তখন সে তরঙ্গের প্রথম আঘাত কোথায়? কে আমার মনে এই ভাবসমূহ উৎপন্ন করে? আর, প্রতিকার্য্যের সহিত যখন ইচ্ছার যোগ দেখি, ইচ্ছা ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি যখন বুঝি না, তখন ত জগদান্তরালে এক ইচ্ছাময় কর্ত্তাকে—মানিয়া লইতে হয়? দুই দিক হইতে একথার উত্তর দিব;—(১) "আমি ইচ্ছা করিয়া উৎপন্ন করিতেছিনা অথচ কিরূপে ভাবের উৎপত্তি হইতেছে" এ অন্ধকারকে আলোকিত করিতে গিয়া, "কেহ করিতেছে" এইটী মানিয়া লওয়া হইল; ইহাতে অন্ধকার কমিল না বাড়িল? যাহা এক পদ অগ্রে ছিল, তাহাকে আর এক পদ পশ্চাতে সরাইয়া দিলে; ইহাতে কিছু বিশেষ লাভ হইয়াছে কি? আরও বলি, যদি এই উপস্থিত ভাব, কে করিল, কে করিল, বলিয়া চিৎকার করা দার্শনিক যুক্তি, তবে কর্ত্তাকে কে করিল বলিয়া চিৎকার করা ত অধিকতর যুক্তি যুক্ত হইতেছে? যদি তাহা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ অনন্ত শৃঙ্খলের শেষ কোথায়? এ অন্ধকার-সাগরের পর পার কোথায়? (২) কার্য্যের সহিত যে ইচ্ছার সর্ব্বত্রই যোগ আছে, কে বলিল? "আমাতে" এমন অনেক কার্য্যত সংঘটিত হইতেছে, যে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার সহিত কোন যোগ নাই? অনিচ্ছায় শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, অনিচ্ছায় রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, অনিচ্ছায় পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হইতেছে। এমনও পড়িয়াছি যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, দুর্ব্বলতা বশত এখন যাহা ইচ্ছা করিয়া করি, শারীরিক উন্নতি হইলে সেই সমুদয় কার্য্য অনিচ্ছায় সাধিত হইবে। এ যুগে যে সকল ক্রিয়া (শ্বাস পরিপাক ইত্যাদি) অনিচ্ছায়

হইতেছে, এক সময়ে তাহা ইচ্ছা করিয়া, কষ্ট করিয়া করিতে হইত। যদি বলেন যে, ক্রমোন্নতির এ কথার অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই; আমি বলি, যদি কখনও পাওয়া যায়? যদি কখনও আমরা ইচ্ছা-শূন্য হইয়া কেবল বিমলানন্দ অনুভব করি? তখন ইচ্ছা বেচারার অভাবে কি দিয়া ঈশ্বর প্রমাণ করিব? জিজ্ঞাসা করি, এরূপ বালির ভিত্তির উপর ঈশ্বর-স্থাপনের ফল কি? আরও এক তর্ক আছে: যদি ইচ্ছা দেখিয়া ইচ্ছাময় ঈশ্বর কল্পনা করিতে হয়, তবে সে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকিল কৈ? ইচ্ছা কথাটাকে যে রূপেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, এমন ইচ্ছা কখনও দেখিয়াছেন কি, যাহার উৎপত্তি অহেতুকি (without motive)? ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্ব্বিকার ঈশ্বরের ইচ্ছা জন্মিবার হেতু বা motive কি? যদি বল জানি না, তবে ইচ্ছা কথাটা ব্যবহারও করিও না; ইচ্ছা দিয়া ঈশ্বর গড়াইতে চেষ্টাও করিও না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের যুক্তিদ্বারা প্রমাণ হয় না, তেমনি এ স্থলেও হইল না। প্রত্যক্ষ কথাকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে গেলে, এবং (সর্ব্বোপরি) ঈশ্বরকে প্রমাণাধীন করিতে গেলে এইরূপ বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়; কখনও বা ঈশ্বর বুঝিতে পারা যায় না, এবং কখনও বা তিনি মানুষ হইয়া দাঁড়ান; এ কথা Mansel এর অতি সুন্দর কয়েক ছত্রে বেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"From the (above) examination of necessary truths, it may be shown that no matter of fact can be a matter of demonstration in the highest sense of the term. For it is essential to demonstration that its object should be such as we can construct from within, out of the forms inherent in our mental constitution; and it is essential to the existence of a fact, as such, that it should be presented to us from without. A fact, as such, must exist independently of my thinking about it: an object of demonstration, as such, exists only in and by the act of conceiving it. This consideration is sufficient to explain the failure of all attempts to demonstrate, *apriori*, the being and attributes of God. If we can demonstrate the attributes of those objects only which we have constructed for ourselves, follows that the demonstrated God is a creature of human imagination." (Mansel's Metaphysics 278-79)

এইস্থলে আর একটী কথা না বলিলে বোধ হয় আমাদের এই তর্ক অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইচ্ছা হইতে শক্তি বোধ হয়, এ কথাও এই শ্রেণীর প্রমাণকারীগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হইতেছে না। শক্তির জ্ঞান, উদ্যম (effort) হইতে; এই উদ্যম আবার আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতারই পরিচয়মাত্র। আমি অনেক কার্য্য করিব, ইচ্ছা করিতেছি, এবং কার্য্য হইতেছে; কিন্তু তাহাতে উদ্যম নাই, আমাদের এরূপ অভিজ্ঞতা আছে। যখন সম্পূর্ণ বিকাশের দিকে আমাদের গতি, তখন বুঝা যাইতেছে যে, এক সময় এই উদ্যম তিরোহিত হইবে; শক্তিজ্ঞান একেবারেই থাকিবে না।

যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন; তাঁহাদের আর এক যুক্তি সৃষ্টি কৌশল, এবং সেই সৃষ্টি কৌশল হইতে স্রষ্টার পরিচয়। নব্যভারতের পাঠক মহাশয়েরা এতৎ সম্বন্ধে সপক্ষীয় কথা নগেন্দ্র বাবুর সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধে অনেক পড়িয়াছেন; অতএব তাঁহাদের কথা আর

অধিক পরিমাণে আমার বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, এই কৌশলের যুক্তিও আমার নিকট পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয় না। এ যুক্তির বিরুদ্ধে আমার অনেক বলিবার আছে; কিন্তু অত কথা বলিয়া সকলকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা নাই; সংক্ষেপত গোটা-কতক কথা বলি। ১ম ত—জগতের উপাদান এবং বিকাশ শক্তির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে যে, এই পৃথিবী একদিনে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ থাকিবে না—ক্রমশই উন্নততর অবস্থায় আসিতেছে। এমন এক সময় ছিল, যখন অতি কষ্টে পৃথিবীতে বাস করা যাইত; আজ কাল তেমন কষ্ট নাই, তবুও নিতান্ত কম নহে; আশা আছে ভবিষ্যতে মনুষ্য জাতির পূর্ণ সুখ হইবে। যদি এ জগৎ ঈশ্বরের কৌশল নির্ম্মিত, তবে পৃথিবী, মানবাবিষ্কৃত কলের মত নিত্য উন্নতি-প্রার্থী কেন? কেহ বলিতে পারেন যে, অসম্পূর্ণাবস্থা হইতে সম্পূর্ণে পরিণতিই জগতের নিয়ম। বুঝিলাম। এই অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তি ত এক জনের ভাগ্যে ঘটে না? এক অসম্পূর্ণ হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যুগেরই বিকাশ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি, এ উন্নতিতে আমার সুখ কি? আমার বুকের রক্তে পরের অট্টালিকার সিমেণ্ট হইতেছে; ইহাতে আমার সুখ কোথায়? এক যুগের বুকে বংশদলন, এবং অন্য যুগের সুখ বর্দ্ধন; এ প্রকার কৌশলকে সদর্পে দাঁড় করান কি লজ্জার কথা নয়? আরও কথা আছে; পৃথিবী যেমন অবনত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় পরিণত হইতেছে, তেমনি আবার সম্পূর্ণ উন্নতি হইলে পৃথিবীর ধ্বংশও (dissolution) সাধিত হইবে। উন্নতি ও ক্রমবিকাশ (evolution) যেমন জগতের নিয়ম-সূত্রের ভাগ্যে বিধাতার কলমে অঙ্কিত হইয়াছে; ধ্বংশ ও অবনতিও (dissolution) আবার তেমনি অচ্ছেদ্য নিয়মে বদ্ধ। উন্নতি দেখিয়া যদি মঙ্গলময় এবং কৌশলকারী ঈশ্বর মানিতে হয়, তবে এই ধ্বংশের আইন দেখিয়া কেন তাঁহাকে নির্ম্মম বল না? অথবা অন্ধ জড়ের অন্ধকারই পরিনাম, এইরূপ সিদ্ধান্ত কর না? (২) আজ পৃথিবীর এমন অবস্থা হইয়াছে (যে প্রকারেই হউক) যাহাতে এখানে জীবের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছে; আমরা জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারি এরূপ বন্দোবস্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছে; এখন আমি যদি চারি দিকের অবস্থা গুলির সম্বন্ধে এইরূপ কথা প্রয়োগ করি যে, "আহা এই অবস্থাপুঞ্জ কেমন আমাকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী রহিয়াছে!" তাহা হইলে কি ভ্রম হয় না? আসল কথা এই যে, আমার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই আমি রহিয়াছি; না হইলে আমিও থাকিতাম না; এমন সুন্দর কৌশলের যুক্তি দিয়া ঈশ্বর প্রমাণও করিতে পারিতাম না। (৩) এখন পর্য্যন্ত মনুষ্য শরীরে নখ ও নানা প্রকার কেশ আছে, পূর্ব্বে যাহার প্রয়োজনীয়তা ছিল কিন্তু এখন আর নাই; এবং বুঝা যাইতেছে যে, অবিলম্বে তাহারা ধ্বংশপুরেও যাইবে: বল দেখি এখানে কি প্রকার কৌশল প্রযুক্ত হইতেছে? (৪) কৌশল সম্পন্ন বলিলে, ঈশ্বরকে নির্ম্মাতা বুঝায়, স্রষ্টা বুঝায় না। (৫) কৌশলের যুক্তি কারণবাদের অংশ মাত্র; কাজেই কারণবাদ

ভ্রমাত্মক হইলে, কৌশলও ভ্রমাত্মক হয়। (৬) কৌশল বলিলে, কৌশলকারী সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইতে পারেন না। এস্থলে একটী কথা বলি. নগেন্দ্র বাবু তাঁহার অতি সুন্দর অতি সুপাঠ্য ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা গ্রন্থে কৌশলের যুক্তি, সর্ব্ব প্রথমে সন্নিবিষ্ট না করিলে ভাল করিতেন। বোধ হয়, তাড়াতাড়ি ছাপায় এরূপ হইয়া থাকিবে।

পাঠকগণ, দর্শন বিজ্ঞানের বিচারে ঈশ্বর কেমন আয়ত্ত তাহা দেখিলেন? ঈশ্বর বিচার সম্বন্ধে ফরাসী-পণ্ডিত জুবা-র্টের অমৃতময়ী লিপি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি:—

"It is not hard to know God, provided one will not force oneself to define him. Do not bring into the domain of reasoning that which belongs to our innermost feeling. In things that are visible and palpable, never prove what is believed already; in things that are certain and mysterious (mysterious by their greatness and by their nature) make people believe them and do not prove them."(Mathew Arnold's translation)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রবাসী।

(১)

লও, মা, অন্তরে,
বুকের ভিতরে,
কাতর পরাণে,
কোথা বা যাই!
আমি যে দুয়ারে,
ডাকি ধীরে ধীরে,
প্রাণের অন্তরে,
আঘাত পাই!

(২)

সংসার যাতনা,
বহিতে পারিনা,
শোকের পেষণে
ভাঙ্গিয়া যাই!
বারেক ফিরিয়া,
দেখ গো চাহিয়া,
প্রবাসী সন্তানে
আবার দ্বারে।

(৩)

লও মা অন্তরে,
একেলা প্রান্তরে,
একাকী সংসারে,
ভাসিয়া যাই!
দেয়া, শান্তি, প্রেম,—
ভকতি, বিরাম,
পরাণি জুড়াই,
অমর হই!

(৪)

যুগ যুগান্তর,
ছাড়ি এই দ্বার,
গিয়াছি ভাসিয়া,
নরকে ছুটিয়া;
কেন ডাকিলে না?
কেন রাখিলে না?
কেন গো সন্তানে
চরণ দিলে না?